ইসলামের বাস্তব কাহিনী-৩

আল্লামা আবুন নূর মুহাম্মদ বশীর (রহঃ)

মুহাম্মদী কুতুবখানা

প্রকাশিকাঃ

মিসেস হাসিনা রহমান
নিশান প্রকাশনী
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

প্রকাশকালঃ

১লা অক্টোবর, ২০০০ ইং
পূনমুদ্রণ - ২ জানুয়ারী ২০০৩ইং
পূনমুদ্রণ - ৮ আগষ্ট ২০০৬ইং

হাদিয়া ঃ সাদা-৯০ /=
নিউজ- ৫০/=

কম্পোজ ও মুদ্রণেঃ

এনাম্‌স প্রিন্টার্স এণ্ড কম্পিউটার
আন্দরকিল্লা, চট্টগ্রাম।

অনুবাদকের কথা

আহলে বায়তে এজাম ও আইম্যায়ে কিরাম সম্পর্কিত বিভিন্ন আকর্ষণীয় কাহিনী নিয়ে ইসলামের বাস্তবকাহিনী (৩য় খণ্ড) প্রকাশিত হলো। আশা করি ১ম খণ্ড ও ২য় খণ্ডের মত ৩য় খণ্ডও সুধী পাঠক মহলের কাছে সমাদৃত হবে। এ খণ্ডে বর্ণিত কাহিনীগুলোর মধ্যে কারবালার লোমহর্ষক কাহিনীগুলো বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। বাস্তবকাহিনীর মূল লেখক আল্লামা আবুন নুর মুহাম্মদ বশীর সাহেব বিভিন্ন নির্ভরযোগ্য কিতাবাদি থেকে এ কাহিনীগুলো সংগ্রহ করেছেন। তিনি কাহিনীগুলো এমনভাবে উপস্থাপন করেছেন যে কাহিনীগুলো পাঠে পাঠক মহল কারবালার সঠিক ধারণা লাভে সক্ষম হবেন। কাহিনীগুলো অতি সংক্ষিপ্ত হলেও লেখক আসল চিত্রটা তুলে ধরতে চেষ্টা করেছেন। তিনি কোন কল্পনার আশ্রয় নেননি। অনুবাদ করার সময় মূল লেখকের ভাবটা যথাযত প্রতিফলিত করার জন্য চেষ্টা করা হয়েছে। অনুবাদে কোন অসংগতি দেখা গেলে তা অনুবাদকের দুর্বলতা হিসেবে ধরে নিতে হবে, মূল লেখকের নয়।

সূধী পাঠক মহলের কাছে আকুল আবেদন, তাঁদের চোখে কোন অসংগতি বা মারাত্মক ভুল ত্রুটি ধরা পড়লে, মেহেরবানী পূর্বক যেন অবহিত করা হয়। যাতে পরবর্তী সংস্করণে সংশোধন করা যায়।

অনুবাদক

সূচী

আহলে বায়ত সম্পর্কিত কাহিনী

কাহিনী নং-২৬৪

উম্মুল মুমেনীন হযরত খদীজাতুল কোবরা (রাদিআল্লাহু আন্‌হা)

কুরাইশ বংশে খাওলীদ নামে এক বড় সরদার ছিলেন। হযরত খদীজা (রাদিআল্লাহু আন্‌হা) ছিলেন তাঁরই একমাত্র কন্যা। তিনি ছিলেন রূপে-গুণে, স্বভাব-চরিত্রে ও বুদ্ধিমত্তায় সারা মক্কার মধ্যে অদ্বিতীয়া। তাঁর পিতা অনেক ধন-সম্পদ রেখে মারা যান এবং তিনিও যৌবনকালে বিধবা হন। তাঁর চাচাতো ভাই অরকা বিন নওফল ছাড়া তাঁর আপন বলতে আর কেউ ছিল না। হযরত খদীজা (রাদিআল্লাহু আন্‌হা) বাপের ব্যবসার দায়িত্বভার নিজেই গ্রহণ করেন এবং দক্ষতার সাথে পরিচালনা করেন।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চাচা আবু তালেবের সুপারিশে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত খদীজার ব্যবসায়িক কাজে যোগদান করেন। তাঁর যোগদানের পর ব্যবসায় যথেষ্ট উন্নতি সাধিত হয় এবং অতি অল্পদিনের মধ্যে ব্যবসায় আমূল পরিবর্তন আসে। এ উন্নতি ও বরকত হযরত খদীজার মনে দারুন রেখাপাত করে।

একদিন হযরত খদীজা (রাদিআল্লাহু আন্‌হা) স্বীয় মহলের ছাদের উপর দাঁড়িয়ে ছিলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে প্রখর রোদ্রে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আসতেছেন এবং তাঁর সাথে সাথে একটি মেঘের টুকরা তাঁর মাথার উপর ছায়াপাত করে এগিয়ে আসতেছে। এটা দেখে হযরত খদীজা ভীষণ আশ্চর্যান্বিত হলেন এবং হুযূরের প্রতি তাঁর সম্মান বোধ আরো বৃদ্ধি পেলো। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে ডেকে বললেন– আমার ব্যবসায়িক কাফেলার সাথে এবার আপনাকেও বাইরে পাঠাতে চাচ্ছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এতে সম্মতি জ্ঞাপন করলেন।

হযরত খদীজার ব্যবসার প্রধান ম্যানেজার ছিল তাঁর আযাদকৃত গোলাম মায়সারা, যার অধীনে ছিল ব্যবসার যাবতীয় হিসেব নিকেশ। হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) মায়সারাকে একান্তে ডেকে বলে দিলেন যে এবার কাফেলার সাথে

মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও যাচ্ছেন। তিনি তোমাদেরকে যা পরামর্শ দিবেন, তা মেনে চলিও এবং সফরকালীন তাঁকে কেন্দ্র করে যেসব ঘটনা ঘটবে, তা ভাল মতে স্মরণ রাখিও।

কয়েকদিন পর কাফেলা সিরিয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা দিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ও সহযাত্রী হলেন। কয়েক মন্‌জিল অতিক্রম করার পর ফস্‌তুরা নামে এক খৃষ্টান পাদরীর গির্জার পাশে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একটি বৃক্ষের নীচে তশরীফ রাখলেন। সেই বৃক্ষের ছায়া হুযূরের প্রতি ঝুকে পড়লো। পাদরী এ ঘটনা দেখে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেল এবং মায়সারার কাছে এসে জিজ্ঞেস করলো, এবার তোমাদের কাফেলার সাথে আগত এ নওজোয়ানটা কে? মায়সারা বললো, ইনি কোরাইশবাসী এবং আমাদের সরদার। পাদরী বললো, ইনি শুধু তোমাদের কাফেলার সরদার নন বরং কোন একদিন সারা জাহানের সরদার হবেন। মায়সারা জিজ্ঞেস করলো, আপনি এটা কিভাবে বুঝতে পারলেন? পাদরী বললো, ওনার চোখের লালিমা দেখে মনে হচ্ছে এবং নবী ছাড়া এ বৃক্ষের নীচে অন্য কেউ বসেনি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ইনিই হবেন শেষ নবী। আহ! সে সময় পর্যন্ত আমি যদি জীবিত থাকতাম, যখন তাঁর নবুয়াত প্রকাশ পাবে। অতঃপর মায়সারাকে বিশেষভাবে বলে দিল যে তাঁর সান্নিধ্য ত্যাগ করো না, আন্তরিকতা ও সৎ নিয়তে তাঁর সাথে থেকো। কেননা এ মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হচ্ছেন সেই ব্যক্তি, যাঁকে আল্লাহ তাআলা নাবুয়াত দানে ধন্য করবেন।

এটা ছাড়া রাস্তায় এ ধরনের আরও কয়েকটি ঘটনা সংঘটিত হলো। সিরিয়ায় পৌঁছার সাথে সাথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকতে হযরত খদীজার সমস্ত ব্যবসায়িক সামগ্রী দু'গুণ- চার গুণ মুনাফায় বিক্রি হয়ে গেল। এতে কাফেলার সবাই দারুন খুশী এবং কালবিলম্ব না করে হযরত খদীজা থেকে বাহবা ও পুরস্কার লাভের আনন্দে মক্কার পথে রওয়ানা দিল।

এসব বরকতময় ঘটনাবলীর দ্বারা কাফেলার অন্তর্ভুক্ত সবার মনে হুযূর আলাইহিস সালামের প্রতি তাদের আস্থা আগের থেকে আরও বৃদ্ধি পেল। মায়সারা স্বীয় মালেকার নির্দেশ মুতাবেক একান্ত আদবের সাথে হুযূরের প্রতিটি কাজ ও ঘটমান ঘটনাবলীর প্রতি গভীর দৃষ্টি রেখে সাথে সাথে রইলো। যখন কাফেলা

মক্কার কাছে আসলো, তখন সবাই মিলে সিদ্ধান্ত নিলো যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)ই সবার আগে গিয়ে হযরত খদীজাকে ব্যবসায় অধিক মুনাফা অর্জনের সুসংবাদটা দিবেন।

সে মতে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় বাহনকে জোরে হাঁকিয়ে হযরত খদীজার মহলের দিকে এগিয়ে গেলেন। ঘটনাক্রমে সেই সময় হযরত খদীজা স্বীয় মহলের ছাদের উপর দাঁড়ানো ছিলেন এবং বাহনে আরোহিত ব্যক্তির অদ্ভুত শানমান অবলোকন করলেন। হুযূরের চেহারা মুবারক চাঁদ থেকে অধিক উজ্জল মনে হচ্ছিল এবং একটি মেঘ তাঁর মস্তক মুবারকের উপর ছায়াপাত করে বাহনের সাথে সাথে এগিয়ে আসছিল। এ দৃশ্য খদীজার মনকে গভীরভাবে প্রভাবান্বিত করলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এসে যখন চারগুণ মুনাফায় সব মাল বিক্রি হয়ে যাওয়ার খবর শুনালেন তখন খদীজার মনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বরকত, চরিত্র ও আকীদার প্রতি স্বীয় ধারণা আরও বদ্ধমূল হলো। ইত্যবসরে কাফেলার অন্যরা সবাই এসে পৌঁছলেন। মায়সারা স্বীয় মালেকার কাছে সফরের সমস্ত ঘটনাবলী এবং হুযূরের বরকতের কথা বর্ণনা করলো। পাদরী ওকে যে উপদেশ দিয়েছিল সেটিও ওনাকে শুনালো। হযরত খদীজার দৃঢ় ধারণা হয়ে গেল যে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহ তাআলার মনোনিত ও প্রিয় ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ নন, যাকে বিশ্বের হেদায়েতের জন্য প্রেরণ করেছেন। কিছু দিন নিশ্চুপ থাকার পর একদিন হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) সরাসরি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বিবাহের প্রস্তাব দিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) খুবই লাজুকভাবে এর জবাবে বললেন যে এ ব্যাপারে আমার চাচা আবু তালেবের অনুমতি প্রয়োজন।

অতঃপর হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) আবু তালেবের কাছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে স্বীয় বিবাহের প্রস্তাব পাঠালেন। আবু তালেব হুযূরের কম বয়স ও খদীজার অধিক বয়স হেতু প্রথমে এ প্রস্তাব গ্রহণ করার ব্যাপারে দ্বিধাবোধ করছিলেন। পরে তাঁর স্ত্রীর পরামর্শে এ প্রস্তাব গ্রহণ করেন এবং বিবাহের দিন-তারিখ ঠিক করে ফেলেন। অরকা বিন নওফল, আবু তালেব, হাম্‌জা ও মক্কার অন্যান্য বিশিষ্ট ব্যক্তিদের উপস্থিতিতে যথাসময়ে বিবাহের কাজ সম্পন্ন হয়ে গেল। বিবাহের পর হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) তাঁর সমস্ত মালপত্র, স্থাবর ও অস্থাবর সম্পত্তি হুযূরকে অর্পন করে সমবেত কোরাইশ

সরদারদেরকে লক্ষ্য করে বলেন, আপনারা সাক্ষী থাকুন, আমি স্বেচ্ছায় আমার সমস্ত সম্পদ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে পেশ করছি। আজ থেকে তিনিই এ সব কিছুর মালিক। তিনি ইচ্ছে করলে নিজের কাছে রাখতে পারেন বা কাউকে দিয়ে দিতে পারেন বা আল্লাহর পথে খরচ করতে পারেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত খদীজার সম্মতিক্রমে সমস্ত সম্পত্তি আল্লাহর পথে খরচ করে ফেললেন এবং সকল গোলাম বাঁদীকে মুক্ত করে দিয়ে হযরত খদীজাকেও তাঁর মত দরবেশী জীবন যাপনের ব্যবহারিক শিক্ষা দিলেন।

(মওয়াহেবে লাদুনিয়া ৩৮ পৃঃ তারিখে ইসলাম ৫০-৬৬ পৃঃ)

সবক ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) স্বভাব-চরিত্র, চাল-চলন, রূপে-গুণে, বংশ মর্যাদায় অদ্বিতীয়া ছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সর্বপ্রথম বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হওয়ার সৌভাগ্য তাঁরই হয়েছিল। তিনি বড় উদারমনা, দয়ালু ও দানশীলা ছিলেন। তাঁর সমস্ত ধন-সম্পদ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে সোপর্দ করে দেন।

এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে, আসমান-জমীন সব জায়গায় হুযূরের হুকুমত বিরাজমান। জমীনে যেমনি বৃক্ষরাজি তাঁকে ছায়া দান করে, তেমনি আসমানের মেঘমালাও তাঁর উপর ছায়াপাত করে।

হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) এর সাথে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিবাহের সময় হুযূরের বয়স ছিল পঁচিশ বছর এবং হযরত খদীজার বয়স হয়েছিল চল্লিশ বছর। যতদিন হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহ আন্‌হা) জীবিত ছিলেন, ততদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দ্বিতীয় বিবাহ করেননি। ইব্রাহীম ব্যতীত হুযূরের সমস্ত সন্তান হযরত খদীজার ঘরেই জন্ম গ্রহণ করেছিল।

কাহিনী নং- ২৬৫

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা)

উম্মুল মুমেনীন হযরত খদীজা (রাদি আল্লাহু তাআলা আন্‌হা) এর ইন্তেকালের পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ছিদ্দিকে আকবরের কন্যা হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) কে বিবাহ করেন। কথা প্রসঙ্গে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একবার হযরত আয়েশাকে বলেন– হে আয়েশা!

বিবাহের আগে এক ফিরিশতা উপর্যুপরি তিন রাত স্বপ্নে তোমার আকৃতিকে একটি রেশমী কাপড়ে জড়ায়ে আমাকে দেখায়েছিল এবং বলছিল যে 'এটা আপনার স্ত্রী'। তোমাকে অবিকল সেটার মতই দেখছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আরও বলেন, 'একদিন জিব্রাইল আলাইহিস সালাম আমার কাছে তোমার আকৃতি একটি সবুজ রং এর রেশমী কাপড়ে জড়ায়ে নিয়ে আসেন এবং বলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! এটা উভয় জগতে আপনার স্ত্রী। আল্লাহ তাআলা ওনাকে আপনার সাথে বিবাহ দিয়েছেন।

(মিশকাত শরীফ-৫৬৫ পৃঃ মওয়াহেবে লদুনিয়া- ২০৪ পৃঃ)

সবক ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) এর মর্যাদা অনেক উচ্চ। তিনি উভয় জাহানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সঙ্গিনী। স্বয়ং আল্লাহ তাআলা তাঁকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। যদি কেউ তাঁর পুতঃপবিত্র চরিত্রের উপর কোন রকম অপবাদ দেয়, নিশ্চয় সে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মনে কষ্ট দিল এবং আল্লাহ তাআলারও বিরোধীতা করলো।

কাহিনী নং- ২৬৬

জঘন্যতম অপবাদ

৫ম হিজরীতে বনী মসতলক যুদ্ধ থেকে ফিরে আসার পথে মদীনা মনোয়ারার সন্নিকটে একটি মনজিলে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) বিশেষ প্রয়োজনে এক কিনারায় তশ্‌রীফ নিয়ে গেলেন। ওখানে তাঁর গলার হারটি হারিয়ে যায় এবং তিনি সেটার তালাশে ব্যস্ত রইলেন। এদিকে কাফেলা যাত্রা দিল। তাঁর বাহন উটটিও কাফেলার সাথে রওয়ানা হয়ে গেল। কাফেলার লোকেরা মনে করেছিল যে হযরত আয়েশা হাওদার অভ্যন্তরে আছেন। তিনি (রাদি আল্লাহু আন্‌হা) ফিরে এসে দেখেন যে কাফেলা চলে গেছে। তখন তিনি সেই জায়গায় বসে রইলেন এবং মনে করলেন যে তাঁর সন্ধানে কেউ নিশ্চয়ই আসবেন। কাফেলার ফেলে যাওয়া জিনিস পত্র উদ্ধারের জন্য একজন নিয়োজিত থাকতো। সেই সময় হযরত ছিফওয়ান (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) কে এ কাজে নিয়োজিত করা হয়েছিল। তিনি আসার পথে যাত্রা বিরতির স্থানে হযরত উম্মুল মুমেনীনকে একাকী দেখে উচ্চস্বরে ইন্নালিল্লাহ বলে উঠলেন।

উম্মুল মুমেনীন কাপড় দ্বারা পর্দা করলেন। হযরত ছিফওয়ান তাঁকে তাঁর উষ্টিতে উঠায়ে কাফেলায় পৌঁছালেন। মুনাফেকরা কানা ঘুষা করার সুযোগ পেয়ে গেল এবং নানা কুৎসা রটাতে শুরু করলো। তাঁর শানে যা-তা বলতে লাগলো। উম্মুল মুমেনীন এ অপবাদ শুনে রোগাক্রান্ত হয়ে গেলেন এবং একমাস পর্যন্ত অসুস্থ রইলেন। এ সময়ে মুনাফিকরা তাঁর ব্যাপারে কি কি কুৎসা রটায়েছে, তিনি জানতে পারেননি। কিন্তু উম্মে মস্তা থেকে যখন এ খবর শুনলেন তখন তিনি আরও অধিক রোগাক্রান্ত হয়ে পড়েন এবং এ দুঃখে তাঁর চোখের পানি অনবরত পড়তে রইলো এবং এক মুহূর্তের জন্যও ঘুম যেতে পারেননি। এ অবস্থায় হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর ওহী নাযিল হয় এবং উম্মুল মুমেনীনের পুতঃপবিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দেন এবং সূরা নূরের কয়েকটি আয়াত তাঁর পুতঃপবিত্রতা সম্পর্কে নাযিল করেন। ইরশাদ ফরমান–

لِكُلِّ امْرِئٍ مِّنْهُمْ مَّا اكْتَسَبَ مِنَ الْاِثْمِ وَالَّذِىْ تَوَلّٰى كِبْرَه مِنْهُمْ لَهٗ عَذَابٌ عَظِيْمٌ–

(তাদের মধ্যে প্রত্যেক ব্যক্তির জন্য সেই পাপ রয়েছে, যা সে অর্জন করেছে এবং তাদের মধ্যে যেই সর্বাপেক্ষা বড় ভূমিকা নিয়েছে তার জন্য বড় আজাব রয়েছে।)

অর্থাৎ উম্মুল মুমেনীন সম্পর্কে অপবাদ রটনায় যে যে পরিমাণ অংশ নিয়েছে, যেমন কেউ অপবাদের ঝড় উঠায়েছে, কেউ অপবাদকারীর সাথে সূর মিলায়েছে, কেউ হাসছে, কেউ নীরবে সাঁই দিয়েছে। প্রত্যেকে সে পরিমাণ শাস্তি পাবে। যে সবচে বড় ভূমিকা পালন করেছে, তার জন্য সবচেয়ে বড় আজাব রয়েছে। (কুরআন করীম পারা-১৮, রুকু-৮, খাযায়েনুল ইরফান-৪৯৭ পৃঃ)

সবক ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্হা) সেই মহিয়সী রমণী, যার পুতঃপবিত্রতা সম্পর্কে স্বয়ং আল্লাহ তাআলা সাক্ষ্য দিয়েছেন এবং তাঁর প্রতি অপবাদ দানকারীদের জন্য কঠিন আজাবের ঘোষণা দিয়েছেন। কুরআনের বদৌলতে তাঁকে এমন মর্যাদায় ভূষিত করা হয়েছে যে কিয়ামত পর্যন্ত তাঁর পবিত্রতার জয়গান ঘোষিত হতে থাকবে। এরপরও তাঁর ব্যক্তিগত ব্যাপারে কেউ যদি কোন প্রকার আপত্তি করে বা তাঁর মর্যাদার ব্যাপারে সন্দেহ পোষন করে, সে বড় জাহিল এবং নিজেকে নিজে শাস্তির অধিকারী করলো।

কাহিনী নং- ২৬৭

সাক্ষী সমূহ

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্হা) সম্পর্কে মুনাফিকরা যখন অপবাদ রটালো, তখন হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে লক্ষ্য করে বললেন, ওর পক্ষে আমার কাছে কারো কি কোন কিছু বলার আছে?

হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আন্হু) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! মুনাফিকরা নিঃসন্দেহে মিথ্যুক এবং উম্মুল মুমেনীন অবশ্যই পবিত্র। আল্লাহ তাআলা আপনার পবিত্র শরীরকে নগণ্য মাছি বসা থেকে নিরাপদ রেখেছেন কেননা সেটা নাপাক জিনিসের উপর বসে। তাহলে এটা কি করে হতে পারে যে আল্লাহ আপনাকে খারাপ মহিলার সংশ্রব থেকে নিরাপদ রাখবেন না।

হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আন্হু) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আপনার ছায়া জমীনে পড়তে দেননি, যাতে সেটার উপর কারো পা না পড়ে। যে পরওয়ারদেগার আপনার ছায়াকে এভাবে সংরক্ষণ করেছেন, সেই পরওয়ারদেগার আপনার স্ত্রীকে নিরাপদ রাখবেন না– এটা কি করে সম্ভব হতে পারে।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আন্হু) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! একটি উকুনের রক্ত লাগার কারণে আল্লাহ তাআলা আপনার পাদুকাদ্বয় খুলে ফেলার নির্দেশ দিয়েছিলেন। যে খোদা আপনার পাদুকা শরীফের অতি সামান্য অপবিত্রতাকে পছন্দ করেননি, সেই খোদা কি করে আপনার স্ত্রীর অপবিত্রতাকে মেনে নিতে পারেন? তা কিছুতেই সম্ভব নয়।

এভাবে অনেক পুরুষ ও মহিলা সাহাবী উম্মুল মুমেনীনের পবিত্রতা সম্পর্কে সাক্ষ্য দেন। আয়াত নাযিল হওয়ার আগে থেকেই উম্মুল মুমেনীনের ব্যাপারে সবার ভাল ধারণা ছিল এবং আয়াত নাযিল হওয়ার পর উম্মুল মুমেনীনের মানমর্যাদা আরও বৃদ্ধি পেলো। (খাযায়েনুল ইরফান-৪৯৭ পৃঃ, রুহুল বয়ান-৭৫১ পৃঃ, ২ জিঃ, মুদারেজুন নাবুয়াত-১০১ পৃঃ)

সবক ঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্হা) এর পবিত্রতা সম্পর্কে হযরত ওমর, হযরত ওসমান, হযরত আলী ও অন্যান্য পুরুষ ও

মহিলা সাহাবীগণের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল এবং অপবাদ রটানোর কাজটা ছিল মুনাফিকদের। অতএব আমাদেরও উচিত যে হযরত ওমর, ওসমান ও আলী (রাদি আল্লাহু আন্হুম) এর অনুসরণ করা এবং মুনাফিকদের অনুসরণ থেকে বিরত থাকা।

উম্মুল মুমেনীনের পবিত্রতা সম্পর্কে হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জানা ছিল। যেমন হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রকাশ্যে বলেছিলেন :

وَاللّٰهِ مَا عَلِمْتُ عَلٰى اَهْلِىْ اِلَّا خَيْرًا

(আল্লাহর কসম, আমি জানি যে আমার স্ত্রী পুতঃপবিত্র) (বোখারী শরীফ-৫৯৫ পৃঃ)

কিন্তু বিচারক যেহেতু স্বীয় অবগতির ভিত্তিতে রায় ঘোষণা করেন না বরং সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে রায় প্রদান করেন, সেহেতু হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) যথারীতি অনুসন্ধান করেছেন এবং সাক্ষ্য গ্রহণ করেছেন। তাছাড়া হুযূর (সাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যদি নিজেই সঙ্গে সঙ্গে রায় ঘোষণা করতেন, তাহলে সূরা নূর নাযিল হওয়ার দ্বারা উম্মুল মুমেনীনের যে সম্মান অর্জিত হয়েছে এবং আল্লাহ তাআলার পক্ষ থেকে তাঁর পবিত্রতা ঘোষিত হয়েছে, যা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোষিত হতে থাকবে, সে সম্মান তাঁর অর্জিত হতোনা।

কাহিনী নং ২৬৮

স্বামীর মহব্বত

এক দিন হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আনহা)কে বললেন, আয়েশা, তুমি আমার উপর কখন সন্তুষ্ট হও এবং কখন অসন্তুষ্ট হও, তা আমি বুঝতে পারি। হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আনহা) আরয করলেন, সেটা কি করে বুঝতে পারেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ? হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, যখন তুমি আমার প্রতি সন্তুষ্ট থাক, তখন বল মুহাম্মদের রবের কসম এবং যখন কোন কারণে অসন্তুষ্ট হও তখন বল ইব্রাহীমের রবের কসম। হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) আরয করলেন, হ্যাঁ, তা ঠিকই, ইয়া রাসুলাল্লাহ। তবে আপনার নামটিই কেবল বর্জন করে থাকি কিন্তু আপনার প্রতি মহব্বত আমার অন্তরে যথারীতি বজায় থাকে। (মুদারেজুন নাবুয়াত

২৭৬ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়াসাল্লাম) এর প্রতিটি কাজ ছিল উম্মতের শিক্ষার জন্য। এ ঘটনায় আমাদেরকে এ শিক্ষা দেয়া হয়েছে যে স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে খুটি-নাটি বিষয় নিয়ে সামান্য মনোমালিন্য হলেও যেন আন্তরিক ভালবাসার মধ্যে কোন ব্যাঘাত সৃষ্টি না হয় এবং এ মনোমালিন্যটাও যেন বৃদ্ধি না পায়।

কাহিনী নং- ২৬৯

বদান্যতা

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা সীমাহীন উদার ছিলেন। হযরত আরওয়া বিন জুবাইর বলেন, আমি উম্মুল মুমেনীনকে একই দিনে সত্তর হাজার দেরহাম আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিতে দেখেছি। একদিন হযরত আবদুল্লাহ বিন জুবাইর (রাদি আল্লাহু আন্হু) তাঁর খেদমতে এক লাখ দেরহাম পাঠিয়ে ছিলেন। তিনি সেই দেরহাম সেই দিনেই আল্লাহর রাস্তায় বন্টন করে দিয়ে দেন। সেই দিন তিনি রোযা রেখেছিলেন। ইফতারের সময় বাঁদী তাঁকে বললেন, আপনার ইফতারীর জন্য একটি দেরহাম রেখে দিলে ভাল হতো, আজ মাংস আনতে পারতাম। তিনি বললেন, আমার স্মরণ ছিল না।

(মুদারেজুন নাবুয়াত-২৭৬ পৃঃ, ২ জিঃ)

সবকঃ উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্হা) স্বাচ্ছন্দ জীবন-যাপন করার সুযোগ থাকা সত্বেও তিনি খুবই সাদাসিদে জীবন-যাপন করতেন। ধন-সম্পদ যা কিছু তাঁর হস্তগত হয়েছিল, তিনি আল্লাহর পথে বিলিয়ে দিয়েছেন। আজ আমাদেরকে উম্মুল মুমেনীনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা উচিত এবং ধন-সম্পদের প্রতি এ রকম মহব্বত রাখা উচিত নয়, যেটা আল্লাহর স্মরণ থেকে দূরে রাখে এবং যাকাত, ছদ্‌কা, খায়রাত ইত্যাদি থেকে বিরত রাখে।

কাহিনী নং- ২৭০

খালাম্মা

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আন্হা) স্বীয় ভাতিজা হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইরকে খুবই স্নেহ করতেন। তাঁরই হাতে উনি লালিত পালিত হয়েছেন। উম্মুল মুমেনীনের সীমাহীন দানশীলতা, উদারতা এবং যা কিছু

পেতেন সব আল্লাহর পথে দান করে ফেলতে দেখে একদিন আব্দুল্লাহ বিন জোবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, খালাম্মার উদার হস্তকে বাধা দেওয়া উচিত। উম্মুল মুমেনীন এ কথা শুনে হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইরের উপর খুবই নাখোশ হলেন এবং তাঁর সাথে কথা না বলার শপথ করলেন। হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) খালাম্মার অসন্তুষ্টির জন্য খুবই মর্মাহত হলেন। অনেক লোকের দ্বারা সুপারিশ করলেন কিন্তু স্বীয় শপথের কথা ব্যক্ত করে কারো কথা রাখলেন না। শেষ পর্যন্ত হযরত আবদুল্লাহ বিন জোবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) অনেক চিন্তাভাবনা করে হুজুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নানার বাড়ীর দুজন বিশিষ্ট ব্যক্তিকে সুপারিশকারী হিসেবে নিয়ে আসলেন। তাঁরা অনুমতি নিয়ে ভিতরে গেলেন। আবদুল্লাহ বিন জোবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু)ও চুপে চুপে ওনাদের সাথে গেলেন; যখন ওনারা পর্দার বাইরে বসে পর্দার অভ্যন্তরে অবস্থানরত উম্মুল মুমেনীনের সাথে কথাবার্তা শুরু করলেন, তখন আবদুল্লাহ বিন জোবাইর (রাদি আল্লাহু আনহু) কালবিলম্ব না করে ভিতরে চলে গেলেন এবং খালাম্মাকে জড়িয়ে ধরে কাঁধতে লাগলেন এবং অনুনয় বিনয় করতে রইলেন। ঐ দু'ব্যক্তিও সুপারিশ করতে রইলেন এবং মুসলমানের সাথে কথা না বলা সম্পর্কিত হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাণীসমূহ স্মরণ করায়ে দিতে লাগলেন এবং হাদীছসমূহে এ ব্যাপারে যে নিষেধাজ্ঞা আছে তা শুনাতে লাগলেন। শেষ পর্যন্ত হাদীছসমূহের নিষেধাজ্ঞা ও মুসলমানদের সাথে কথা না বলার পরিণতির কথা শুনে আর ধৈর্য ধরতে পারলেন না এবং কেঁদে দিলেন। শেষ পর্যন্ত মাফ করে দিলেন এবং কথা বলতে শুরু করলেন। তবে স্বীয় শপথ ভঙ্গের কাফ্ফারা বাবত বার বার গোলাম আজাদ করতে রইলেন। এভাবে চল্লিশ জন গোলাম আজাদ করেছেন। এরপরও যখনই শপথ ভঙ্গের কথা মনে আসতো, এমন কান্নাকাটি করতেন যে তাঁর চোখের পানিতে উড়না ভিজে যেত।

(বোখারী শরীফ, হেকায়াতে সাহাবা ১০১ পৃঃ)

সবকঃ কোন ব্যাপারে আল্লাহওয়ালাগণের অসন্তুষ্টি একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশ্যে হয়ে থাকে। তাঁরা দুনিয়াবী স্বার্থে কারো প্রতি অসন্তুষ্ট হন না। উক্ত কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাণী শুনলে মুসলমানদের মাথা অবনত হয়ে যায়। এটাও জানা গেল যে, আল্লাহর নামে যে শপথ করা হয় সেটা বজায় রাখা খুবই প্রয়োজন এবং বজায় রাখতে না পারলে

কাফ্ফারা দিতে হয়। আল্লাহ ওয়ালাগণের অন্তরে সেই নামের প্রতি খুবই সম্মানবোধ থাকে এবং আল্লাহর প্রতি এমন ভয় থাকে যে কাফ্ফারা আদায় করার পরও ভয়ে কান্নাকাটি করতে থাকেন।

কাহিনী নং ২৭১

রাওজায়ে মাহবুব

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন পর্দার অন্তরালে চলে যান, তখন উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) তাঁর রাওজা মোবারকে হাজির হতেন। হুযূর যেহেতু তাঁর স্বামী ছিলেন, সেহেতু তিনি খোলা মুখে যেতেন। হযরত আবু বকর ছিদ্দিক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকাল হলে, তাঁকেও রওজা শরীফে হুযূরের পাশে দাফন করা হয়। তখনও তিনি খোলা মুখে রওজা শরীফে যেতেন। কারণ সেখানে একজন হলেন তাঁর স্বামী এবং অন্যজন হলেন তাঁর পিতা। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকাল হলে তাঁকেও সেখানে দাফন করা হয়। এরপর থেকে উম্মুল মুমেনীন মুখ ঢেকে রওজা শরীফ যেতে লাগলেন এবং বললেন, এখানে এখন ওমরও আছেন, তিনি আমার জন্য অমুহরেম, তাই ওনার থেকে পর্দা করা দরকার।

(মিশকাত শরীফ ১৪২ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণ কবরে গিয়েও জীবিত থাকেন এবং সবকিছু দেখেন ও শুনেন। এজন্যই উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা হযরত ওমর (রাদ আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকাল ও দাফনের পরও লাজ্জাবোধ করতেন এবং ওনার থেকে পর্দা করতেন।

কাহিনী নং ২৭২

উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফ্ছা (রাদি আল্লাহু আনহা)

হযরত ফারুকে আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কন্যা হযরত হাফ্ছা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর বিবাহ হযরত খুনাইস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে হয়েছিল। হযরত খুনাইসের হঠাৎ ইন্তেকালে হযরত হাফ্ছা যখন বিধবা হয়ে যান তখন হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনাকে নিয়ে চিন্তাযুক্ত হয়ে পড়েন।

হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর স্ত্রী ও হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা হযরত রোকেয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) ইন্তেকাল করলে হযরত ওমর হযরত ওসমানকে তাঁর মেয়ে হযরত হাফছাকে বিবাহ করার প্রস্তাব দেন। হযরত ওসমান এ ব্যাপারে নিরব রইলেন, কোন সম্মতি দিলেন না। হযরত ওমর (রাদি আল্লাহু আনহু) বিষয়টা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে জানালেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, আমি হাফছার জন্য ওসমান থেকে ভাল স্বামী এবং ওসমানের জন্য হাফছা থেকে ভাল স্ত্রী ঠিক করেছি। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত হাফছাকে নিজেই বিবাহ করলেন এবং স্বীয় কন্যা হযরত উম্মে কুলসুমকে হযরত ওসমানের কাছে বিবাহ দিলেন।

(মুদারেজুন নবুয়াত ২৭৭ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে সাহাবায়ে কিরামের রূহানী ও আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিল। ছিদ্দিকে আকবর ও ফারুকে আযম ছিলেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শ্বশুর এবং হযরত ওসমান ও আলী মরতুজা ছিলেন জামাতা। এ পবিত্র ব্যক্তিগণের বিরুদ্ধে কেউ কিছু বললে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয় মনঃ কষ্ট পান।

কাহিনী নং ২৭৩

উম্মুল মুমেনীন জয়নাব বিনতে হাজশ (রাদি আল্লাহু আনহু)

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর ফুফাতো বোন হযরত জয়নাবের বিবাহ হুযূরের পোষ্য পুত্র হযরত যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে হয়েছিল। হযরত যায়েদের সাথে ওনার মিল না হওয়ায় তিনি ওনাকে তালাক দিয়ে দেন। তালাকের পর স্বয়ং আল্লাহ তায়ালা ওনার বিবাহ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে দিয়ে দেন। যখন হযরত যায়েদ (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনাকে তালাক দিয়ে দেন এবং ইদ্দতের সময়ও অতিবাহিত হয়ে যায়, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনার কাছে বিবাহের প্রস্তাব পাঠান। তিনি জবাবে জানালেন যে আল্লাহর মতামত না নিয়ে কিছু বলতে পারবেন না। অতঃপর অযু করে নামায পড়লেন এবং এ মুনাজাত করলেন- হে আল্লাহ! তোমার রসূল আমাকে বিবাহ করতে চায়। আমি যদি তাঁর উপযোগী হই, তাহলে ওনার সাথে

আমার বিবাহ দিয়ে দেন। এদিকে হুযূরের প্রতি এ আয়াত নাযিল হয় فَلَمَّا قَضٰى زَيْدٌ مِّنْهَا وَطَرًا زَوَّجْنَاكَهَا অর্থাৎ যখন সে যায়েদের বন্ধন থেকে বের হয়ে গেল, আমি ওকে আপনার বন্ধনে দিয়ে দিলাম। (২২ পারা ২ রুকু)

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যখন এ আয়াতের সুখবর পাঠালেন, তিনি সানন্দে সিজদায় পতিত হলেন। তিনি এ ব্যাপারে গর্ববোধ করতেন যে সমস্ত বিবিগণের বিবাহ গার্জিয়ানের মাধ্যমে হয়েছে কিন্তু আমার বিবাহ স্বয়ং আল্লাহর মাধ্যমে হয়েছে।

(মুদারেজুন নাবুয়াত ২৭৯ পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে তাঁর পবিত্র বিবিগণের এত উচু শান ছিল যে তারা নিজেদের কোন কাজের ব্যাপারে আল্লাহ থেকে মতামত নিতেন এবং আল্লাহ তায়ালা ওনাদেরকে নৈরাশ করতেন না। এ সব পুতঃপবিত্র স্ত্রীগণের শানে কোন নাফরমান যদি কোন প্রকার সমালোচনা করে, আল্লাহ তায়ালা নিশ্চয় ওদের প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।

কাহিনী নং ২৭৪

লম্বা হাত

উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নাব বিনতে হাজশ (রাদি আল্লাহু আনহু) খুবই দানশীল ছিলেন। তিনি নিজ হাতে মেহনত করে যা উপার্জন করতেন, তা সদকা করে দিতেন। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর পবিত্র স্ত্রীগণকে বললেন, আমার ইন্তেকালের পর সবের আগে সেই আমার সাথে মিলিত হবে যার হাত লম্বা। এ বাণী শুনে সবাই বাহ্যিক লম্বা হাত মনে করলেন এবং একটি কাঠের লাঠি দিয়ে প্রত্যেকের হাত মেপে দেখলেন। এতে দেখা গেল যে হযরত সওদা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর হাত লম্বা লম্বা কিন্তু হযরত যয়নাব (রাদি আল্লাহু আনহা) যখন সবের আগে ইন্তেকাল করলেন, তখন বুঝতে পারলেন যে লম্বা হাত বলতে সদকা-খায়রাতে আধিক্যকে বুঝানো হয়েছিল।

(মুদারেজুন নাবুয়াত ২৯৯ পৃঃ)

সবকঃ দান-খায়রাত দ্বারা আল্লাহ ও রসূলের নৈকট্য অর্জিত হয়।

কাহিনী নং ২৭৫

য়সরিবের বাদশাহ

উম্মুল মুমেনীন হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত মুসা (আলাইহিস সালাম) এর ভাই হযরত হারুন আলাইহিস সালামের বংশধর ছিলেন এবং সরদারের কন্যা ছিলেন। তাঁর প্রথম বিবাহ কেনানা বিন আবি হাকিমের সাথে হয়েছিল। একরাত তিনি স্বপ্ন দেখলেন যে চাঁদ তাঁর কোলে শোভা পাচ্ছে। তিনি তাঁর এ স্বপ্ন স্বামীর কাছে বর্ণনা করলে, সে রাগান্বিত হয়ে ওনার মুখে এমন জোরে এক থাপ্পর মারলো এতে ওনার চোখে আঘাত লাগে। সে আরও বললো, তুমি য়স্‌রিবের বাদশাহকে বিবাহ্ করার স্বপ্ন দেখছ।

খায়বরের যুদ্ধে কেনানা মারা যায় এবং হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) মুসলমানদের হাতে বন্দী হয়ে বাঁদিতে পরিণত হয়। হযরত দাহিয়া কালবী হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে একজন বাঁদী কামনা করলে হুযুর হযরত ছুফিয়াকে দিয়ে দেন। মদীনা মনোয়ারায় যেহেতু ছুফিয়ার গোত্রের অনেক লোক বাস করতো, তাছাড়া নামকরা সরদারের মেয়ে ছিল সেহেতু লোকেরা আরয করলো, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটা অনেকের কাছে অপছন্দ হবে। তবে হুযুর যদি ওকে স্ত্রী হিসেবে গ্রহণ করেন তাহলে সবাই সন্তুষ্ট হবে। অতঃপর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওদের মতে সম্মতি জ্ঞাপন করে হযরত দাহিয়া কালবীকে যথাযথ বিনিময় প্রদান করে ওনাকে ফেরত নিয়ে নেন এবং আযাদ করে বিবাহ করেন। খায়বর থেকে ফেরার পথে কোন এক মঞ্জিলে অবস্থান কালে সকালে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সবাইকে বললেন, খাবার জিনিস যার কাছে যা আছে নিয়ে এসো। সাহাবায়ে কিরামের কাছে খেজুর, পনির, ঘি ইত্যাদি যা ছিল নিয়ে এলেন। একটি চামড়ার দস্তরখানা বিছানো হলো এবং সব কিছু রাখা হলো। অতপরঃ সবাই মিলে খেয়ে নিলেন। এটাই ছিল ওলীমা।

মদীনা মনায়ারার আগের নাম ছিল য়সরিব। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর তশরীফ আনিবার পর এর নাম মদীনা মনোয়ারা হয়ে যায়। এখন মদীনা মনোয়ারাকে য়সরিব বলা না জায়েয। এ কাহিনীতে য়সরিব এ জন্য লিখা হয়েছে যে হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা) এর প্রথম স্বামী য়সরিবই বলে ছিল।

কোন কোন রেওয়ায়েতে এ রকমও বর্ণিত আছে যে, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ছুফিয়াকে ইখতিয়ার দিয়েছিলেন যে সে যদি ইচ্ছা করে স্বীয় গোত্র ও দেশে ফিরে যেতে পারেন আর হুযূরের বিবাহ বন্ধনে থাকতে চাইলে থাকতে পারেন। হযরত ছুফিয়া এর উত্তরে আরয করেছিলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি বিধর্মী থাকাকালে হুযূরকে কামনা করেছিলাম। এখন মুসলমান হয়ে কি করে চলে যেতে পারি? (মওয়াহেবে লাদুনিয়া ২০৫ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ ইসলামে লৌকিকতার অস্তিত্ব নেই। দেখুন, কি সাদাসিদে ওলীমা অনুষ্ঠিত হলো। যার কাছে যা ছিল তা নিয়ে এসে এক দস্তরখানায় রেখে সবাই মিলে খেয়ে নিলেন। আজ সারা বিশ্বে লৌকিকতার ধুম পড়ে গেছে, আত্মীয় স্বজনকে সন্তুষ্ট করার জন্য অপব্যয় করা হয়। এটা কী যে বোকামি যে লৌকিকতা করতে গিয়ে অনেকে সারা জীবনের জন্য ঋণগ্রস্থ হয়ে পড়ে।

কাহিনী নং ২৭৬

নবীর মেয়ে, ভাইঝি ও স্ত্রী

একদিন হযরত হাফসা (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহা)কে বললেন, তুমি ইহুদীর মেয়ে। এতে হযরত ছুফিয়া কাঁদতে লাগলেন। ইত্যবসরে হুযূর সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ঘরে আসলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, ছুফিয়া! কি হয়েছে? তিনি আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, হাফ্‌সা আমাকে ইহুদীর মেয়ে বলেছে। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি কাঁদবে কেন? তুমিতো নবীর মেয়ে, নবীর ভাইঝি ও নবীর স্ত্রী অর্থাৎ তোমার পিতা হচ্ছেন হারুন (আলাইহিস সালাম) জেঠা হচ্ছেন হযরত মূসা (আলাইহিস সালাম) আর আমি হলাম স্বামী। হাফসা তোমার কাছে কি নিয়ে গর্ব করতে পারে? অতঃপর হাফসাকে সম্বোধন করে বললেন, হে হাফসা, আল্লাহকে ভয় কর এবং এ রকম কথা বল না। (মিশকাত শরীফ - ৫৬৬ পৃঃ)

সবকঃ কোন মুসলমানের মনে কষ্ট দেয়া অনুচিত।

ফায়দা ঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র স্ত্রীর সংখ্যার ব্যাপারে মুহাদ্দেছীনে কিরামের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। অবশ্য এগার জন হওয়ার ব্যাপারে সবাই একমত। এগার থেকে অধিকের ব্যাপারে মতভেদ রয়েছে।

এগার জনের নাম হচ্ছে (১) উম্মুল মুমেনীন হযরত খাদিজা (২) উম্মুল

মুমেনীন হযরত আয়েশা (৩) উম্মুল মুমেনীন হযরত হাফসা (৪) উম্মুল মুমেনীন হযরত হাবীবা (৫) উম্মুল মুমেনীন হযরত সালমা (৬) উম্মুল মুমেনীন হযরত সাওদা (৭) উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নব বিনতে হাজশ (৮) উম্মুল মুমেনীন হযরত মায়মুনা (৯) উম্মুল মুমেনীন হযরত যয়নব বিনতে খাযআ (১০) উম্মুল মুমেনীন হযরত হুরিয়া বিনতে হারেছ (১১) উম্মুল মুমেনীন হযরত ছুফিয়া (রাদি আল্লাহু আনহুন্না) (মাওয়াহেবে লুদুনিয়া ২০১ পৃঃ ১ জিঃ)

কাহিনী নং ২৭৭

খাতুনে জান্নাত

হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চার কন্যার মধ্যে হযরত খাতুনে জান্নাত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) হুযূরের খুবই আদরের ছিল। হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) ছিলেন অনেক উচ্চ মর্যাদাশালী। একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উৎফুল্ল মনে তশরীফ আনলেন। হযরত আব্দুর রহমান বিন আউফ (রাদি আল্লাহু আনহু) আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এ আনন্দের রহস্য কি? ফরমালেন, একটি তাজা সুসংবাদের জন্যই আনন্দিত হয়েছি, যেটা এ মাত্র আমার পরওয়ার দেগারের পক্ষ থেকে আলী ও ফাতেমা সম্পর্কে আমাকে জ্ঞাত করা হয়েছে। আজ আল্লাহ তাআলা ফাতেমাকে আলীর সাথে বিবাহ দিয়ে দিয়েছেন।

(নযহাতুল মাজালিস - ৩৭৮ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) অনেক উচ্চ মর্যাদার অধিকারী ছিলেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহা) এর সাথে তাঁর বিবাহ আল্লাহর মর্জি মুতাবেক হয়েছিল।

কাহিনী নং ২৭৮

রসমে শাদী

হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) প্রাপ্ত বয়স্কা হলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে অনেকেই বিবাহের প্রস্তাব দেন। কিন্তু হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সব প্রস্তাবই অগ্রাহ্য করেন। সাহাবায়ে কিরাম (রাদি আল্লাহু আনহুম) পরস্পর সল্লা-পরামর্শ করে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু

আনহু) কে বলেন, আপনিও হুযুরের সমীপে বিবাহের প্রস্তাব দিন। হযরত আবু বকর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ ব্যাপারে সাহায্য করার প্রতিশ্রুতি দেন। এতে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) অনুপ্রাণিত হয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন কিন্তু শরমে মুখ খুলতে পারছিলেন না। তাই মাথা নিচু করে নিশ্চুপ বসে রইলেন। শেষ পর্যন্ত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিজেই বললেন, আলী! ব্যাপার কি? কি বলতে চাচ্ছ? যা বলার আছে বল। তোমার বক্তব্য শুনা হবে। হযরত আলী আমতা আমতা করে স্বীয় উদ্দেশ্য প্রকাশ করলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তা শুনে বললেন, আমি তোমার প্রস্তাব গ্রহণ করলাম। অতঃপর একটি নির্দিষ্ট দিনে মসজিদে নববীতে দেড়শত তোলা চান্দি মোহরানা ধার্য করে হযরত আলীর সাথে হযরত ফাতেমার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হয়।

(তারিখে ইসলাম ১৬২ পৃঃ)

সবকঃ সাহাবায়ে কিরাম হযরত আলীর প্রতি সহানুভূতিশীল ও বন্ধুভাবাপন্ন ছিলেন। হযরত আলীর বিবাহের ব্যাপারে সবাই চেষ্টা করেন এবং হযরত ছিদ্দিকে আকবর আর্থিক সাহায্য করেছেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে আল্লাহ ও রসুলের অভিমতও ছিল যে হযরত ফাতেমার বিবাহ হযরত আলীর সাথে হোক।

কাহিনী নং ২৭৯

শাদীয়ে মুবারক

হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর বিবাহের সময় বয়স হয়েছিল পনের এবং হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বয়স হয়েছিল বাইশ বছর। হযরত আলীর পক্ষ থেকে বিবাহের প্রস্তাব দেয়া হলে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তা সানন্দে গ্রহণ করেন এবং হিজরী সনের দ্বিতীয় বছর ১৭ই রজব সোমবার বিবাহের দিন ধার্য করেন। সারা মদীনা শহরে ঘোষণা দিয়ে দিলেন যেন ঐ দিন যোহরের সময় সবাই মসজিদে নববীতে অগমন করেন। এ সংবাদে সারা মদীনা মুখরিত হয়ে উঠে। নির্দিষ্ট দিনে যোহরের সময় মসজিদে নববী লোকে লোকারণ্য হয়ে গেল। এক পাশে হযরত ছিদ্দিকে আকবর ও ওমর ফারুক (রাদি আল্লাহু আনহুমা) আর এক পাশে হযরত উসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) বসলেন,

চারিদিকে আনসার ও মুহাজের ঘিরে বসলেন এবং মাঝখানে হযরত আলীকে সামনে নিয়ে আমাদের নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাশরীফ রাখলেন। তখন এক স্বর্গীয় দৃশ্য শোভা পাচ্ছিল যেন আরশ জমীনে নেমে এসেছে। যখন সমাবেশ ভরপুর হয়ে গেল তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথমে খোতবা পাঠ করলেন, অতঃপর ১৫০ ভরি চান্দি মোহরানা ধার্য করে হযরত আলীর সাথে খাতুনে জান্নাতের আক্দ পড়ায়ে দিলেন। এরপর খোরমা ছিটায়ে দিলেন। অন্য কোন খানাপিনার আয়োজন ছিল না। অতঃপর নব-দম্পতির জন্য বিশেষ দুআ করা হলো এবং প্রত্যেকে মুবারকবাদ দিলেন। ঘর থেকে বিদায়ের বেলায় মরহুমা মায়ের কথা স্মরণ করে যখন হযরত ফাতিমা কাঁদছিলেন, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, মা, তুমি কাঁদছ কেন, তুমিতো সব দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ। তোমার বাপ হচ্ছেন ইমামুল আম্বীয়া আর তোমার স্বামী হচ্ছেন ইমামুল আওলীয়া।

হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) শ্বশুর বাড়ীতে যাওয়ার পরদিন এক দাওয়াতের আয়োজন করা হয়েছিল। মেহমানদের জন্য দশ সের যবের রুটি, কিছু পনির এবং যৎ সামান্য খোরমার ব্যবস্থা করা হয়েছিল। এ দাওয়াতের নাম ওলীমা এবং এ দাওয়াত হচ্ছে সুন্নাত।

সবকঃ এ সুন্নাত রীতি মেনে চলা প্রত্যেকের উচিত এবং যাবতীয় কুপ্রথা বর্জন করা আবশ্যক।

কাহিনী নং ২৮০

যৌতুক

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর প্রাণ প্রিয় কন্যাকে সতের তালি দেয়া একটি চাদর, একটি চামড়ার তোশক, খেজুর গাছের ছাল ভর্তি একটি বালিশ ও একটি লেপ, একটি আটা পিষার চাক্কি, পানির জন্য একটি মোশক, একটি কাঠের পেয়ালা, এক জোড়া রূপার চুড়ি, গলায় পড়ার জন্য একটি হাতির দাঁতের হাত ও এক জোড়া খড়ম যৌতুক হিসেবে দিয়ে ছিলেন। কোন প্রকারের দাবী দাওয়ার প্রশ্ন উঠেনি। হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) বিনা বাহনে পায়ে হেঁটে হযরত আলীর ঘরে গিয়েছিলেন।

(দেওয়ানে সালেক- ৩১ পৃঃ)

সবকঃ যার জন্য উভয় জাহান সৃষ্টি করা হলো তাঁর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ সাদাসিদে জিন্দেগীতে মুসলমানদের জন্য বিরাট শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে।

কাহিনী নং ২৮১

শাহজাদীর সাংসারিক জীবন

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) স্বামীর ঘরে আসার পর ঘরের সমস্ত কাজের দায়িত্ব তাঁর উপর পড়লো। সবকাজ নিজেকে করতে হতো বিধায় কাপড় চোপড় মলিন হয়ে যেতো এবং হাতে চাক্কির দাগ পড়ে ছিল। একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) জানালেন যে নবীজী (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যুদ্ধ বন্দী বণ্টন করতেছেন। যদি সেখান থেকে আমরা একটা বাঁদী পেতাম, তোমার কষ্ট অনেক লাঘব হতো। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত আয়েশা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর ঘরে গেলেন। নবীজী ঘরে না থাকায়, মাকে তাঁর আগমনের উদ্দেশ্যের কথা বলে আসলেন। নবীজী ঘরে আসলে হযরত ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত ফাতেমার আগমনের কথা শুনালেন এবং যা বলে গেছেন সব জানালেন। রাত্রে নবীজী ফাতেমার ঘরে গেলেন এবং ফরমালেন, হে আমার কলিজার টুকরা, তোমার কষ্টের কথা আমি শুনেছি। কিন্তু যুদ্ধ বন্দী নর-নারীগুলো সে সব এতিমদের জন্য, যাদের বাপ যুদ্ধ ক্ষেত্রে শহীদ হয়েছে। তুমিতো আমার ছায়াতলে আছ। আল্লাহর উপর ভরসা রেখো, আমি তোমাকে এমন এক তসবীহের কথা বলছি, যেটা নিয়মিত পড়লে বাঁদী গোলামের কথা ভুলে যাবে। সেটা হলো প্রথমে ৩৩ বার সুবহানাল্লাহ, এরপর ৩৩ বার 'আলহামদুলিল্লাহ' অতঃপর ৩৪ বার 'আল্লাহু আকবর' বলবে, যেন সর্বমোট একশবার হয়। এভাবে সকাল-বিকাল পড়তে থেকো। এ কথা শুনে হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) খুশী হয়ে গেলেন এবং এ আমলের ফলে জীবনে আর কোন দিন গোলাম বাঁদীর অভাব বোধ করেন নি।

(দেওয়ানে সালেক - ৩২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর অনুসরণে যারা এ আমল করবে, ইনশা আল্লাহ তারাও কোন দুঃখ কষ্ট ভোগ করবে না।

আল্লামা রেহাবী জামেউল মুজিজাত গ্রন্থে উল্লেখ করেছেন যে হযরত ফাতিমা

(রাদি আল্লাহু আনহা) হাতে আটা পিষতেন, মুখে কুরআন তেলাওয়াত করতেন, অন্তরে এর তফসীর করতেন, পা দ্বারা হযরত হাসান-হোসাইনের দোলনায় দোল দিতেন এবং চোখের দ্বারা আল্লাহর ধ্যানে কাঁদতেন আর আজকালকার মহিলারা হাতে ঢুকঢুকি বাজায়, মুখে পরনিন্দা করে, অন্তরে পার্থিব বিলাসিতা কামনা করে, চোখের দ্বারা বেহায়াপনা প্রকাশ করে এবং পা দ্বারা নাচের আসর জমায়। এ ধরণের মহিলারা কি করে জান্নাতের প্রত্যাশা করতে পারে?

কাহিনী নং ২৮২

জান্নাতের পোষাক

এক ধনাট্য ইহুদীর মেয়ের বিয়েতে অনেক মহিলাকে দাওয়াত দিল। ওরা অনেক নামী দামী কাপড় পরে বিবাহ মজলিশে আসলো এবং এ সুযোগে যে কোন উপায়ে মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর মেয়ে ফাতেমাকে এবং এর দারিদ্র জীবন যাপনটা দেখার জন্য খুবই আগ্রহ প্রকাশ করলো। তাই ইহুদীর মেয়েটি হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে ডাকার জন্য কাউকে পাঠালো। হযরত ফাতিমাও বিবাহ অনুষ্ঠানে যোগ দিতে রাজি হয়ে গেলেন। এ দিকে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম জান্নাতের এক জোড়া পোষাক নিয়ে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে হাজির হলেন। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই পোষাক হযরত ফাতেমাকে পরিধান করতে দিলেন। হযরত ফাতিমা সেই কাপড় পরিধান করে ইহুদীর মেয়ের বিয়েতে গেলেন। যখন তিনি ওসব মহিলাদের পাশে গিয়ে বসলেন, তখন তাঁর কাপড় থেকে নূরের ঝলক বিচ্ছুরিত হচ্ছিল। মহিলারা আশ্চার্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, ফাতেমা, তুমি এ কাপড় কোথায় পেলে? তিনি বলেন, আমার আব্বা দিয়েছেন। ওরা জানতে চাইলো, তোমার আব্বা কোত্থেকে পেল? বললেন, হযরত জিব্রাইল এনে দিয়েছেন। ওরা পুনরায় জিজ্ঞেস করলো, জিব্রাইল কোথা থেকে এনেছে? হযরত ফাতিমা বললেন, জান্নাত থেকে। এ কথা শুনে সবাই এক সঙ্গে কলেমায়ে শাহাদাত পাঠ করলো এবং নারায়ে তাকবীর ও নারায়ে রেসালতের শ্লোগানে সমস্ত ঘর মুখরিত হয়ে উঠলো। (নজহাতুল মাজালিস ২৭৯ পৃঃ, ২ জিঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও আহলে বায়তের সদস্যগণ

সাদাসিদে ও গরীবানা জীবন যাপন করতেন। এ ধরনের সাদাসিদে জীবন যাপন নিজেদের ইচ্ছানুযায়ী ও উম্মতের শিক্ষার জন্য ছিল। নচেৎ তারা জান্নাতের অধিকারী ছিলেন এবং তাঁদের পোষাকও জান্নাত থেকে তৈরী হয়ে আসতো।

কাহিনী নং ২৮৩

শাহী দাওয়াত

একদিন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আজ আপনাকে আমার ঘরে দাওয়াত দিতে চাচ্ছি। হুযুর দাওয়াত কবুল করলেন এবং যথাসময়ে স্বীয় সাহাবীগণ সহ হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরের দিকে যাত্রা দিলেন। হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু)ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পিছে পিছে চললেন এবং যাত্রা পথে ওনার গৃহ পানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যতটি কদম রাখছিলেন, তা গণনা করতে লাগলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ওসমানকে জিজ্ঞেস করলেন,আমার কদম কেন গণনা করছ? হযরত ওসমান আরয করলেন,ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমার মা-বাপ আপনার জন্য উৎসর্গিত, আমি মনস্থ করেছি যে, আমার গৃহ পানে আপনার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে আপনার সম্মানার্থে এক একটি গোলাম আযাদ করবো। সে মতে হযরত ওসমানের ঘর পর্যন্ত হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যতটি কদম রেখেছেন ততটি গোলাম আযাদ করেছেন।

এ দাওয়াতে হযরত আলীও শরীক ছিলেন। দাওয়াত খেয়ে ঘরে আসলে হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) ওনাকে খুবই বিষন্ন দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি এত পেরেশান কেন? উত্তরে বললেন, ফাতিমা, আজ হযরত ওসমান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে এক বড় শানদার দাওয়াত খাওয়ায়েছেন এবং ওনার গৃহ পানে হুযূরের প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক এক জন গোলাম আযাদ করেছেন। আহ, কী যে আফসোস! এ রকম একটি দাওয়াত আমি হুযূরকে দিতে পারলাম না। হযরত ফাতেমা বললেন, আপনি এর জন্য নৈরাশ হচ্ছেন কেন, যান, আপনিও হুযূরকে দাওয়াত দিয়ে আসেন। হযরত আলী বললেন, এত বড় আয়োজন ও প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক একজন গোলাম আযাদ করা কি আমাদের পক্ষে

সম্ভব? হযরত ফাতিমা বললেন, ইনশা আল্লাহ সব ব্যবস্থা হয়ে যাবে। হযরত আলী নবীর দুলালীর কথার উপর আস্থা রেখে হুযূরের সমীপে হাজির হয়ে দাওয়াত দিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) দাওয়াত কবুল করলেন এবং যথাসময়ে স্বীয় সাহাবায়ে কিরাম সহ তাশরীফ নিয়ে গেলেন। হযরত ফাতিমা সবাইকে যত্ন সহকারে বসালেন এবং নিজ ঘরের নির্জন এক কোণায় গিয়ে সিজ দায় পতিত হলেন এবং আল্লাহর কাছে আরয করলেন, হে আল্লাহ! তোমার বান্দা ফাতেমা তোমার মাহবুব ও তাঁর সাথীগণকে তোমার উপর ভরসা করে দাওয়াত করেছে। হে আল্লাহ! তুমি আমার ইজ্জত রক্ষা কর এবং এ দাওয়াতের খাবারের ব্যবস্থা তুমি করে দাও।

এ দুআ প্রার্থনা করার পর হযরত ফাতিমা চুলার উপর ডেক্‌সি রাখলেন এবং পুনরায় কেঁদে কেঁদে আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করতে লাগলেন। হে মওলা, তোমার বান্দা ফাতিমাকে লজ্জিত করোনা। আল্লাহ তাআলার করুণার সাগর উতলিয়ে উঠলো। তিনি সেই ডেকসি জান্নাতের খাদ্য দ্বারা ভরপুর করে দিলেন। হযরত ফাতিমা সেই ডেক্‌সি থেকে সবাইকে খাবার পরিবেশন করলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সাহাবীগণ তৃপ্তি সহকারে খাবার গ্রহণ করলেন কিন্তু ডেকসির মধ্যে একটুও কমলো না।

খাবার গ্রহণ করার পর হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সাহাবায়ে কিরামকে বললেন, তোমরা জান, এ খাবার কোথা থেকে এসেছে? সাহাবায়ে কিরাম আরয করলেন জানি না, ইয়া রাসুলাল্লাহ! ফরমালেন, এ খাবার আল্লাহ তায়ালা আমাদের জন্য জান্নাত থেকে পাঠিয়েছেন। সাহাবায়ে কেরাম এটা শুনে ভীষণ খুশী হলেন।

হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) পুনরায় এক কিনারায় চলে গেলেন এবং সিজদায় পতিত হয়ে দুআ করলেন, হে আল্লাহ! হযরত ওসমান তোমার মাহবুবের এক এক কদমের বিনিময়ে এক এক গোলাম আযাদ করেছেন, কিন্তু তোমার বান্দা ফাতিমার এতটুকু সামর্থ নেই। তবে যেভাবে তুমি আমার খাতিরে জান্নাত থেকে খাবার প্রেরণ করে আমার ইজ্জত রক্ষা করেছ, সেভাবে আমার খাতিরে তোমার মাহবুব যতটি কদম রেখে আমার ঘরে তশরীফ এনেছেন, প্রতিটি কদমের বিনিময়ে তোমার মাহবুবের গুনাহগার উম্মতদেরকে জাহান্নাম থেকে আজাদ করে দাও।

হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এ দুআ থেকে ফারেগ হতে না হতে হযরত জিব্রাইল আলাইহিস সালাম হাজির হয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা আমাকে এ সংবাদ দিয়ে পাঠিয়েছেন যে আপনার কন্যার দুআ গ্রহণপূর্বক আল্লাহ তাআলা আপনার প্রতিটি কদমের বিনিময়ে এক হাজার গুনাহগারকে জাহান্নাম থেকে রেহাই করে দিয়েছেন। এ সুসংবাদ শুনে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ও সাহাবায়ে কিরাম দারুন খুশী হলেন।

(জামেউল মুজেহাত - ৬৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর শান অনেক উর্ধে। তাঁর খাতিরে আল্লাহ তাআলা জান্নাত থেকে খাবার পাঠিয়েছেন এবং তাঁর খাতিরে আল্লাহ তাআলা গুনাহগার বান্দাদেরকে জাহান্নাম থেকে মুক্ত করে দিয়েছেন। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় দানশীল ও হুযুরের জন্য জান কুরবান ছিল। এটাও জানা গেল যে সাহাবায়ে কিরাম ও আহলে বায়ত সবাই পরস্পরের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখতেন।

কাহিনী নং ২৮৪

গোপন কথা

উম্মুল মুমেনীন হযরত আয়েশা ছিদ্দিকা (রাদি আল্লাহু আনহা) বর্ণনা করেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জীবনের শেষ অসুখের সময় একদিন হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) তাঁকে দেখতে আসেন। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁকে তাঁর ডান পাশে বসালেন এবং কোন একটা গোপন কথা বললেন, যেটা শুনে হযরত ফাতিমা কেঁদে দিলেন। পুনরায় আর একটি কথা বললেন, যেটা শুনে হেসে দিলেন। আমি ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বেটী, আজ আমি এটা কি দেখলাম যে প্রথমে তুমি কাঁদলে পরক্ষণে আবার হাসলে। হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) বললেন, আমি রাসুলাল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর গোপন কথা ফাঁস করতে পারবো না। যখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) পর্দার অন্তরালে চলে যান, তখন আমি পুনরায় হযরত ফাতেমাকে জিজ্ঞেস করলাম, বেটী, এখনতো বলতে পার যে ঐ

দিন তোমাদের মাঝে কি কথা হয়েছিল যে প্রথমে তুমি কেঁদেছিলে, পরে আবার হেসেছিলে। হযরত ফাতিমা বললেন, আম্মীজান! হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথমে আমাকে বলেছিলেন- 'আমার সাথে জিবরাইল আলাইহিস সালাম প্রতি বছর কুরআন শরীফ একবার দওরা করতেন কিন্তু এ বছর দু'বার দওরা করেছেন, আমার মনে হয় আমার বেছালের সময় এসে গেছে। এ কথা শুনে আমি কেঁদে দিয়েছিলাম। পুনরায় যখন বললেন, আহলে বায়তের মধ্যে সবার আগে তোমার বেছাল হবে, তখন আমি হেসে দিয়েছিলাম।

(বোখারী শরীফ ৫১২ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এক বিশেষ মর্তবার অধিকারী ছিলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর বেছাল সম্পর্কে জ্ঞাত ছিলেন।

কাহিনী ২৮৫

হযরত ফাতিমার বেছাল

খাতুনে জান্নাত হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) যখন মৃত্যু শয্যায় শায়িত ছিলেন, তখন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনাকে বলেন, ফাতেমা, আমার একটি অনুরোধ- যখন তুমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে পৌঁছবে, আমার সালাম পেশ করিও এবং বলিও আমি তাঁর জন্য উৎসর্গিত। হযরত ফাতিমা বললেন, আমারও একটা অনুরোধ আছে। সেটা হচ্ছে, যখন আমার ইন্তেকাল হবে, তখন চিল্লা-চিল্লি করে যেন মাতম করা না হয় এবং আমার চোখের মনি হাসন- হোসাইনকে যেন মারধর করা না হয়। এর একটু পরে হযরত আলীকে ডাক দিয়ে বললেন, হে শেরে খোদা! দেখুন , হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফিরিস্তাগণের সমাবেশে তশরীফ এনেছেন। আমি যাচ্ছি, অমুক জায়গায় আমি একটি কাগজের টুকরা খুবই যত্ন সহকারে রেখেছি। আমার ইন্তেকালের পর সেই কাগজটি ওখান থেকে নিয়ে আমার কাফনের মধ্যে রেখে দিবেন এবং পড়বেন না।

হযরত আলী হযরত ফাতিমাকে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দোহাই দিয়ে জিজ্ঞেস করলেন- আমাকে একটু বল, সে কাগজে কি লিখা

আছে? হযরত ফাতিমা বললেন, আপনার সাথে যখন আমার বিবাহ হচ্ছিল, তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, ফাতিমা আমি চারশ মিশকাল চান্দির মোহরানা ধার্য করে আলীর সাথে তোমাকে বিবাহ দিচ্ছি। আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আলীর ব্যাপারে আমার কোন আপত্তি নেই কিন্তু এ মোহর আমার মনঃপুত নয়। ইত্যবসরে জিবরাইল আমীন উপস্থিত হয়ে হুযূরের কাছে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আল্লাহ তাআলা ফরমান- আমি জান্নাত ও জান্নাতের নেয়ামতসমূহ ফাতিমার মোহর ধার্য করছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে এ খবর জানালে এতেও আমি রাজি হলাম না। তখন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আমাকে বললেন, তাহলে তুমি নিজেই বল তোমার মোহরানা কি হওয়া চায়? আমি আরয করলাম, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আপনি সবসময় আপনার উম্মতের চিন্তায় থাকেন, তাই আমি চাচ্ছি যে আপনার গুনাহগার উম্মতের ক্ষমাই আমার মোহরানা নির্ধারিত হোক। অতঃপর জিবরাইল আমীন আরশে ফিরে গেলেন এবং এ কাগজের টুকরাটা নিয়ে আসলেন, যেটায় লিখা আছে- جَعَلْتُ شَفَاعَةَ اُمَّتِ مُحَمَّدٍ صَدَاقَ فَاطِمَةَ

অর্থাৎ আমি উম্মতে মুহাম্মদীর শাফায়াতকে ফাতিমার মোহরানা ধার্য করলাম।

(জামেউল মুজেজাত- ৬২ পৃঃ) .

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতে আমরা গুনাহগারদের উপর আল্লাহর বড় মেহেরবানী রয়েছে। হুযূরের কন্যাও আমরা গুনাহগারদের প্রতি খেয়াল রেখেছেন এবং আমাদের ক্ষমার জন্য সুব্যবস্থা করে গেছেন। যারা বলে যে আল্লাহ ওয়ালাদের থেকে কিছু লাভ করা যায় না,তারা কত বড় মূর্খ এর থেকে বুঝা যায়। উক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে কারো মৃত্যুতে চিল্লাচিল্লি করে মাতম করা অনুচিত। এ বিষেয়ে খাতুনে জান্নাতও নিষেধ করেছেন।

কাহিনী নং ২৮৬

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) ও কূফার ফৌজ

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) কূফা থেকে ফৌজ তলব করেছিলেন এবং অনেক আলোচনা সমালোচনার পর ফৌজ পাঠানো হয়েছিল। ফৌজ আসার

আগেই হযরত আলী ঘোষণা করেছিলেন যে কূফা থেকে বার হাজার ফৌজ আসতেছে। এ খবর শুনে তাঁর এক সভাসদ ফৌজের আগমনের পথে গিয়ে অবস্থান নিলেন এবং ফৌজ এসে পৌছলে এক এক করে গণনা করে দেখলেন যে বরাবর বার হাজারই ছিল, একজনও কেমবেশী হয়নি। (শাওয়াহেদুন নবুয়াত-৬ পৃঃ)

সবকঃ হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অদৃশ্য জ্ঞান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বদৌলতেই প্রাপ্ত। তাই হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর জ্ঞানের প্রসারতার কথা বলার অবকাশ রাখে না। তা সত্বেও যদি কেউ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সম্পর্কে এ রকম বলে যে তাঁর কাছে দেয়ালের পিছনের জ্ঞানও ছিলনা, সে কত বড় জাহিল, তা বিশ্লেষণ করে বলার প্রয়োজন নেই।

কাহিনী নং ২৮৭

দলিল লিখন

এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে এসে আরয করলেন, আমি একটি জায়গা ক্রয় করেছি। আপনি মেহেরবানী করে আমাকে একটা দলিল লিখে দিন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, ঠিক আছে। তবে প্রথমে দলিলের খসড়া শুনুন, পরে চুড়ান্তভাবে দলিল লিখা হবে। খসড়াটা হলো-

اِشْتَرٰى مَغْرُوْرٌ مِنْ مَغْرُوْرٍ دَارًا لَا بَقَاءَ لَهَا وَلَا لِصَاحِبِهَا وَهِىَ فِىْ سِكَّةِ الْغَافِلِيْنَ - اَلْحَدُّ الاَوَّلُ الْمَوْتُ وَالْحَدُّ الثَّانِى الْقَبْرُ وَالْحَدُّ الثَّالِثُ الْحَشْرُ وَالْحَدُّ الرَّابِعُ غَيْرُ مَعْلُوْمٍ اِمَّا الْجَنَّةُ اَوِ النَّارُ-

অর্থাৎ- একটি জায়গা প্রতারিতব্য ব্যক্তি প্রতারিত ব্যক্তি থেকে ক্রয় করেছে। সেই জায়গাও থাকবেনা এবং সেই জায়গার অধিকারীও থাকবেনা। সেই জায়গাটা হচ্ছে অলসলোকদের চলাচলের পথ। এ জায়গার চতুরসীমানার একটি হচ্ছে মৃত্যু দ্বিতীয়টা হচ্ছে- কবর, তৃতীয়টা হচ্ছে- হাসরের ময়দান এবং চতুর্থটা জান্নাত, নাকি জাহান্নাম, তা জানা নেই।

খরিদ্দার এ খসড়া শুনে কেঁদে দিলেন এবং জায়গা আর খরিদ করলেন না। (সীরাতুস সালেহীন-৭১ পৃঃ)

সবকঃ দুনিয়া ও দুনিয়ার অধিবাসী কারো স্থায়িত্ব নেই। শেষ পর্যন্ত সবকিছু ফানা হয়ে যাবে। তাই মানুষের উচিত যে সব সময় মৃত্যু, কবর ও হাসরের কথা স্মরণ করা।

কাহিনী নং-২৮৮

আমলের সিন্দুক

কমিল নামক এক ব্যক্তি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আন্হু) এর সাথে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে একটি কবরস্থান সামনে পড়লে, হযরত আলী কবরবাসীকে সম্বোধন করে বললেন, হে আহলে কবর, হে জনমানব শুন্য ভয়াল জায়গার অধিবাসী, কি খবর এবং কি অবস্থায় আছেন? পুনরায় বললেন, আমাদের এখানকার খবর হচ্ছে, আপনাদের মৃত্যুর পর আপনাদের সম্পদ বন্টন হয়ে গেছে, আপনাদের সন্তানাদি এয়াতিম হয়ে গেছে এবং আপনাদের স্ত্রীগণ অন্য স্বামী গ্রহণ করেছে। অতঃপর বললেন, এ গুলোতো আমাদের খবর, আপনাদের কিছু খবরাখবর বলুন। হযরত আলী কমিলকে সম্বোধন করে বললেন, হে কমিল, এদের যদি কথা বলার অনুমতি থাকতো, তাহলে এরা জবাবে এটাই বলতো যে সর্বউৎকৃষ্ট সম্বল হচ্ছে- তাকওয়া। এটা বলার পর হযরত আলী কেঁদে দিলেন এবং কমিলকে বললেন, হে কমিল, কবর আমলের সিন্দুক। মৃত্যুর পর কবরে এটা জানা হয়ে যায়।

(হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন- ৮৬২ পৃঃ)

সবকঃ মৃত্যুর পর মানুষের সব কিছু এখানে রয়ে যায় এবং সব জিনিসপত্র অন্যদের কব্জাধীন হয়ে যায়। একমাত্র নেক আমলই মানুষের সাথে যায়। কোন এক কবি সুন্দর বলেছেন-

کہا احباب نے یہ دفن کے وقت - کہ ہم کیونکر وہاں کا حال جانیں

لحد تك آپ کی تعظیم کردی - اب اگے اپ کے اعمال جانیں

অর্থাৎ- মৃত ব্যক্তির কি অবস্থা হবে, ওনার বন্ধু বান্ধবরা কেউ কিছু জানে না। ওনাদের দায়িত্ব হচ্ছে সসম্মানে কবর পর্যন্ত পৌঁছায়ে দেয়া। পরবর্তীতে ওর আমল অনুসারে যা হবার আছে তা হবে।

উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল যে, কবর হচ্ছে আমলের সিন্দুক। সিন্দুকে যেভাবে জিনিসপত্র হেফাজতে থাকে, তদ্রুপ মানুষের ভাল-মন্দ কাজের প্রতিফল ওর কবরে মাহফুজ থাকে।

কাহিনী নং- ২৮৯

খোশালাপ

একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আন্হু) কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন এবং তাঁর ডানে বামে দু'জন দীর্ঘাকৃতির সাহাবীও সাথে যাচ্ছিলেন। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আন্হু) এর দেহ মুবারক ওনাদের থেকে খাট হওয়ায় ওনাদের দু'জনের মাঝখানে ওখানে খুবই ছোট দেখাচ্ছিল। তাই ওনাদের মধ্যে একজন খোশালাপ স্বরূপ হযরত আলীকে বললেন أَنْتَ بَيْنَنَا كَالنُّوْنِ فِىْ لَنَا আপনি আমরা দু'জনের মাঝখানে لَنَا শব্দের ن এর মত। অর্থাৎ আমরা দু'জন আপনার তুলনায় খুবই দীর্ঘ। হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আন্হু) ঝটপট উত্তরে বললেন- لَوْ لَمْ أَكُنْ بَيْنَكُمَا لَكُنْتُمَا لَا অর্থাৎ যদি-আমি তোমাদের মাঝখানে না হতাম, তাহলে তোমরা অস্তিত্বহীন হয়ে যেতে। কেননা لَنَا শব্দের ن বর্ণটা বাদ দিলে لَا হয়ে যায়, যার অর্থ না এবং অস্তিত্বহীন।
(কশফুল গুম্মা- ৩০৮ পৃঃ)

সবকঃ পবিত্র লোকদের রসিকতাও পবিত্র ও জ্ঞানীসুলভ হয়ে থাকে। এ ধরনের রসিকতা শরীয়তে জায়েয আছে। রসিকতা ও খোশালাপ করতে চাইলে এ ধরনের করা চায়।

কাহিনী নং ২৯০

পরীক্ষা

একদিন হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু)কে অথর্ব এক মুশরিক বললো, আপনাকে তো অনেকবার বলতে শুনেছি যে আল্লাহ আমাদের হেফাজতকারী ও সাহায্যকারী। আপনার এ কথাটা যদি সত্য হয় এবং এর প্রতি যদি আপনার পূর্ণ আস্থা থাকে, তাহলে এ ঘরের ছাদের উপর উঠে বিসমিল্লাহ বলে একবার লাফ দিয়ে দেখান যেন আমি দেখতে পাই যে, আপনার খোদা কিভাবে মৃত্যু থেকে রক্ষা

করতে পারে। হযরত আলী বলেন, তোমার এ প্রশ্নটা তোমার মূর্খতার প্রমাণ। তোমার কথা হচ্ছে আমি যেন আমার সৃষ্টিকর্তার পরীক্ষা গ্রহণ করি। আমরা হলাম বান্দা, সৃষ্টিকর্তার পরীক্ষা নেয়ার আমার কী অধিকার আছে। তিনি হলেন সর্ব শক্তিমান। ওনার কাজের বেলায় কারো টু শব্দ করার অধিকার নেই। (মসনবী শরীফ ৩৬-পৃঃ)

সবক ঃ মানবের এ অধিকার রয়েছে যে স্বীয় চাকরের আজ্ঞাবহতার ব্যাপারে যতবার হচ্ছে যাচাই করে দেখা। তবে কোন চাকর যদি মনিবের পরীক্ষা নিতে চায় ওকে সবাই পাগলই বলবে।

কাহিনী নং ২৯১

একটি প্রশ্নের জবাব

জবরীয়া কদরীয়া চিন্তাধারায় প্রভাবিত এক ব্যক্তি হযরত আলী মরতুজার কাছে গিয়ে বললো, জনাব বোধশক্তিকে কিছুতেই প্রবোধ দিতে পারছিনা। আপনি ব্যাপারটা আমাকে বুঝায়ে দিন। তিনি বললেন আমার সামনে সোজা দাড়িয়ে যাও। সাথে সাথে সে সোজা হয়ে দাঁড়িয়ে গেল। হযরত আলী বললেন হ্যাঁ, তুমি ঠিক মত দাঁড়িয়েছ। এবার একটু কষ্ট করে একটি পা একটু উচু কর। সে সঙ্গে সঙ্গে এক পায়ের উপর দাঁড়িয়ে গেল এবং বললো আর কিছু করার আছে? এ কথাটা সে কিছুটা গর্ব করে বলেছিল যে তার কাছে এসব কিছু করার ইখতিয়ার ও ক্ষমতা আছে।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহ আনহু) বললেন ঠিক আছে, এবার অন্য পাটিও উঠায়ে দেখাও। এটা শুনে সে বললো এ ব্যাপারে আমি অপারগ। এটাতো হতেই পারে না। তখন হযরত আলী ওর কান ধরে বললো, এবার পেয়ে গেলেতো নিজের মুখে নিজের উত্তর? (মছনবী ৪৪ পৃঃ)

সবকঃ যদিওবা সবাই নিজেকে কর্তা বলে কিন্তু সবকিছুর আসল কর্তা হচ্ছেন আল্লাহ। মানুষের মধ্যে প্রায় গুণাবলী থাকলেও সে দুর্বল এবং একান্ত অস্থায়ী।

কাহিনী নং ২৯২

হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু)

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে কোলে নিয়ে উপবেশন করেছিলেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) একবার লোকদের দিকে একবার হযরত হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর দিকে তাকাচ্ছিলেন এবং বলছিলেন আমার নাতি সরদার হবে এবং আল্লাহ তাআলা ওর মাধ্যমে মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে সন্ধি স্থাপন করাবেন।
(মিশকাত শরীফ ৫৬১ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খুবই আদরের ছিল। তাই প্রত্যেক মুসলমানের ওনার প্রতি মহব্বত রাখা উচিত। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) মুসলমানদের দুটি বড় দলের মধ্যে যে সন্ধির কথা বলেছেন, সেটা সেই ঘটনার দিকে ইঙ্গিত ছিল, যেটা হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকালের পর হযরত ইমাম হাসন ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে হয়েছিল। হযরত আলীর ইন্তেকালের পর যখন হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) খেলাফতে আসীন হন, তখন মুসলমানদের একটি দল হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পক্ষ অবলম্বন করে এবং দ্বিধাবিভক্তির কারণে একটি রক্তক্ষয়ী যুদ্ধের সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এমতাবস্থায় ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) কয়েকটি শর্ত সাপেক্ষে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার হাতে খেলাফতের দায়িত্বভার ছেড়ে দেন এবং মুসলমানদের দু'টি দলকে গৃহযুদ্ধ থেকে রক্ষা করেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এটা জানা ছিল যে ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর নেতৃত্বে মুসলমানদের মধ্যে দু'টি দলের সৃষ্টি হবে এবং ইমাম হাসন হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার হাতে খেলাফতের দায়িত্বভার ছেড়ে দিবেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে হযরত হাসন ও হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার অনুসারী উভয় দল

যবরীয়া-কদরীয়া চিন্তাধারায় বিশ্বাসী লোকেরা মনে করে যে মানুষ নিজের ইচ্ছায় কিছু করতে পারে না। ভালমন্দ সব কিছু আল্লাহর ইচ্ছায় হয়ে থাকে। তকদীরে যা লিখা আছে তাই হয়ে থাকে।

মুসলমান ছিল। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর হাদীছে 'মুসলমানদের দু'টি বড় দল' উল্লেখ করেছেন। হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সম্মানিত সাহাবী ছিলেন। ওনার সম্পর্কে কোন প্রকারের বেআদবী না জায়েয। এটা জেনে রাখা দরকার যে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার মধ্যে কোন দুর্বলতা থাকলে হযরত হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনার পক্ষে খেলাফতের দায়িত্ব হস্তান্তর করতেন না এবং ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)ও বিরোধিতা করতেন, যেভাবে ইয়াজিদের বিরোধীতা করেছিলেন।

কাহিনী নং ২৯৩

দেড় লক্ষ

হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পক্ষ থেকে হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জন্য বার্ষিক এক লক্ষ টাকা ভাতা নির্ধারণ করেছিলেন। এক বছর হযরত হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হাতে ভাতা পৌছাতে বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। যার ফলে ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) মারাত্মক আর্থিক সংকটে পড়েছিলেন। তিনি এ ব্যাপারে হযরত আমীরে মুয়াবিয়াকে কিছু লিখার জন্য মনস্থ করলেন এবং দোয়াত কলম আনালেন। পরে কিছু একটা চিন্তা করে বিরত রইলেন। রাত্রে স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার নসীব হলো। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, কেমন আছ? তিনি উত্তরে আরয করলেন, আলহামদুলিল্লাহ, ভাল আছি। তবে বার্ষিক ভাতাটা এখনও না পাওয়ায় আর্থিক সমস্যার সম্মুখীন হয়েছি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন এ জন্যই কি স্বীয় কষ্টের কথা উল্লেখ করে অভিযোগ পত্র লিখে পাঠাবার জন্য দোয়াত-কলম আনায়ে ছিলে? আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ! একান্ত বাধ্য হয়ে ছিলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তোমার মত মখলুকের কাছে লিখ না, আল্লাহর কাছে আরয কর এবং এ দুআটি পাঠ করতে থাকো।

اَللّٰهُمَّ اَقْذِفْ فِىْ قَلْبِىْ رَجَاءَكَ وَاقْطَعْ رَجَاءِىْ عَنْ سِوَاكَ
حَتّٰى لَا اَرْجُوْا اَحَدًا غَيْرَكَ اَللّٰهُمَّ وَمَا ضَعُفَتْ عَنْهُ قُوَّتِىْ
وَقَصُرَعَنْهُ عَمَلِىْ وَلَمْ تَنْتَهِ اِلَيْهِ رَغْبَتِىْ وَلَمْ تَبْلُغْهُ مَسْئَلَتِىْ

وَلَمْ يَجْرِ عَلٰى لِسَانِيْ مِمَّا اَعْطَيْتَ مِنَ الْاَوَّلِيْنَ وَالْاٰخِرِيْنَ مِنَ الْيَقِيْنِ وَخُصَّنِيْ بِهٖ يَارَبَّ الْعَالَمِيْنَ ۰

অর্থাৎ হে আল্লাহ! আমার অন্তর আপনার কামনায় ভরে দিন এবং আপনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে আশা আকাংখার ধারণা মন থেকে বিদূরীত করে দিন যেন আপনি ব্যতীত অন্য কারো থেকে কোন কিছু প্রত্যাশা না করি। হে আল্লাহ যে জিনিস থেকে আমার ক্ষমতা দুর্বল, আমার আমল নগন্য এবং আমার আগ্রহ ওখান পর্যন্ত পৌঁছেনি এবং আমার মুখে উচ্চারিত হয়নি, যে গুলোর ব্যাপারে আপনি আগে পরের সবাইকে নিশ্চয়তা দান করেছেন। অতএব হে সমস্ত জগতের প্রতিপালক, সে ক্ষেত্রে আমাকেও মনোনিত করুন।

হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, এ আমলটি শুরু করার এক সপ্তাহ অতিবাহিত হয়নি, হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) আমার কাছে দেড় লক্ষ টাকা পাঠিয়ে দিলেন। আমি এর শুকরিয়া আদায় করলাম। পুনরায় স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার নসীব হলো। হুযূর ইরশাদ ফরমালেন, হে হাসন, কেমন আছ? আমি আল্লাহর শোকর আদায় করে ঘটনা আরয করলাম। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, হে বৎস, যে স্বীয় সৃষ্টিকর্তার সাথে সম্পর্ক রাখে, ওর কাজ এভাবে হয় (তারীখুল খোলাফা ৩৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মনে হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি সম্মানবোধ ছিল। তিনি ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জন্য যুক্তিসঙ্গত ভাড়া নির্ধারণ করে রেখেছিলেন। এক বছর বিলম্ব হওয়ায় এর ক্ষতিপূরণ স্বরূপ অর্ধলক্ষ টাকা বাড়িয়ে দেন। এটাও বুঝা গেল যে ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেলাফত ও ইমামতকে জায়েয মনে করতেন। তা না হলে হযরত আমীরে মুয়াবিয়ার পক্ষ থেকে নির্ধারিত অজিফা (ভাতা) কখনো গ্রহণ করতেন না।

কাহিনী নং ২৯৬

উত্তম আরোহী

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শৈশবাস্থায় ওনাকে স্বীয় কাঁধ মুবারকের উপর বসায়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। পথে এক ব্যক্তি ইমাম হাসনকে হুযূরের কাঁধের উপর দেখে বললেন, হে বাচ্চু

অনেক উত্তম সওয়ারীর উপর আরোহন করেছ। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এটা শুনে বললেন, আরোহীও অনেক উত্তম (তারিখুল খোলাফা ৩২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খুবই প্রিয়পাত্র ছিলেন। সুতরাং ওনার প্রতি মহব্বত রাখা মানে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সন্তুষ্টি অর্জন।

কাহিনী নং ২৯৫

দোষীকে বখশীশ

একদিন হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) কয়েকজন মেহমান নিয়ে স্বীয় খাবার খাচ্ছিলেন। তিনি তাঁর গোলামকে তরকারী নিয়ে আসার জন্য বললেন, সে তরকারী আনার সময় হঠাৎ হাত থেকে তরকারীর পাত্র পড়ে গিয়ে ভেঙ্গে যায় এবং তরকারীর কিছু অংশ ইমাম হাসনের গায়ের উপরও পড়ে। গোলাম এতে ঘাবড়িয়ে যায়। হযরত ইমাম হাসন ওর দিকে তাকালে সে ঝটপট এ আয়াতটি পাঠ করেঃ وَالْكَاظِمِيْنَ الْغَيْظَ। (এবং রাগ দমনকারীগণ) তখন হযরত ইমাম হাসন বললেন আমি রাগ হজম করে ফেললাম। সে পুনরায় পাঠ করলো وَالْعَافِيْنَ عَنِ النَّاسِ। (এবং লোকদের ক্ষমাকারীগণ) তখন তিনি বললেন যাও, আমি তোমাকে মাফ করে দিলাম। সে আবার পাঠ করলো وَاللّٰهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِيْنَ।(এবং আল্লাহ ইহসানকারীগণকে ভালবাসেন) তখন তিনি বললেন, যাও, আমি তোমাকে আজাদ করে দিলাম। (রুহুল বয়ান ৩৬৭ পৃঃ)

সবক ঃ অধীনস্থদের প্রতি রহম করা উচিত। রাগ হজম করা, দোষীকে মাফ করে দেয়া এবং ওর প্রতি ইহসান করা আল্লাহর প্রিয় বান্দাদের কাজ। ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু)ও আল্লাহর প্রিয় বান্দা ছিলেন।

কাহিনী নং ২৯৬

দানশীল পরিবার

একবার হযরত ইমাম হাসন, ইমাম হোসাইন এবং হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাদি আল্লাহু আনহুম) হজ্ব করতে যাচ্ছিলেন। যে উটটির উপর তাঁদের মাল-পত্র ও খাদ্য দ্রব্য ছিল, সেটা তাঁদের থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পিছনে কোথাও পড়ে রয়েছিল। এক জায়গায় ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে এক বুড়ীর কুঁড়ে ঘরে গিয়ে

উঠলেন এবং বুড়ীকে বললেন, পান করার মত কিছু আছে? বুড়ী বললো, হ্যাঁ নিশ্চয় আছে, এ বলে বুড়ী তার পালিত ছাগীটির দুধ দোহন করে এনে দিল। ওনারা বুড়ীকে পুনরায় বললেন, খাবার কিছু আছে, সে বললো, তৈরী করা নেই, এ ছাগীটা জবেহ করে খেয়ে নিতে পারেন। সে মতে তাঁরা ছাগীটি জবেহ করে তৃপ্তি সহকারে খেলেন। বিদায় বেলায় বুড়িকে বললেন, আমরা কোরাইশ বংশের লোক। মদীনা মনোয়ারায় থাকি। এ সফর থেকে ফিরে আসলে তুমি আমাদের কাছে যেও। আমরা তোমার এ ইহসানের বদলা দিব। রাত্রে বুড়ীর স্বামী ঘরে এসে বুড়ীর কর্মকাণ্ডের কথা শুনে রাগান্বিত হয়ে বললো, আমাদের একমাত্র সম্বল ছাগলটি এমন লোকদেরকে জবেহ করে খাওয়ালে, যাদেরকে তুমি জান না, চিন না। কিছু দিন পর সেই বুড়া-বুড়ী অভাবের তাড়নায় মদীনা শরীফে এসে উপনিত হলো এবং উটের মল কুড়ায়ে বিক্রি করে কোন মতে জীবনধারণ করতে লাগলো। একদিন বুড়ী কোথাও যাবার পথে হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বীয়ঘর থেকে বুড়ীকে দেখতে পেলেন এবং চিনে ফেললেন। বুড়ীকে কাছে ডেকে জিজ্ঞেস করলেন, আমাকে চিন? বুড়ী বললো, না। তিনি পরিচয় দিলেন, আমি সেই ব্যক্তি, যে অমুক দিন তোমার মেহমান হয়েছিল। বুড়ী গভীর দৃষ্টিতে দেখে বললো, হ্যাঁ এবার চিনছি। ঠিকই আপনি আমার কুঁড়ে ঘরে গিয়েছিলেন। ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এক হাজার ছাগল এবং এক হাজার দিনার দেয়ার জন্য তার অধীনস্থ ব্যক্তিদেরকে নির্দেশ দিলেন। নির্দেশ মত ছাগল ও দিনার দেয়ার পর তাঁর এক গোলামকে সাথে দিয়ে বুড়ীকে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন, ভাইজান তোমাকে কি দিয়েছেন? বুড়ী এক হাজার ছাগল ও দিনারের কথা বললো। হযরত ইমাম হোসাইনও বুড়ীকে এক হাজার ছাগল ও এক হাজার দিনার দিলেন এবং বুড়ীকে হযরত আব্দুল্লাহ বিন জাফর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। হযরত আব্দুল্লাহ বুড়ীকে জিজ্ঞেস করলেন হযরত ইমাম হাসন-হোসাইন তোমাকে কি দিয়েছে? সে দু'হাজার ছাগল ও দিনারের কথা বললো। হযরত আবদুল্লাহ বিন জাফরও দুই হাজার ছাগল ও দু'হাজার দিনার দিলেন। বুড়ী এ চার হাজার ছাগল ও চার হাজার দিনার নিয়ে স্বীয় স্বামীর কাছে ফিরে আসলেন এবং বললো, এ উপঢৌকন সেই মেহমানগণ দিয়েছে যাদেরকে আমি ছাগল জবেহ করে খাওয়ায়েছিলাম।

(কিমিয়ায়ে সাদাত- ২৫৯ পৃঃ)

সবকঃ আহলে বায়তের পরিবার দানশীল পরিবার। গরীব বুড়ী অজান্তে মাত্র একটি ছাগল জবেহ করে মেহমানদারী করেছিল। পরে আহলে বায়তের বদান্যতায় বুড়ী ধনী হয়ে গিয়েছিল। যদি কেউ ওসব পবিত্র ব্যক্তিগণকে জেনে শুনে ওনাদের নামে নজর নিয়াজের মাধ্যমে ইছালে সওয়াব করে, তাহলে সে দীন-দুনিয়ায় কেন সফলকাম হবে না?

কাহিনী নং ২৯৭

মূল্যবান শরবত

হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে এক মেহমান এসেছিল। তিনি খাবার গ্রহণ করার পর শরবত চাইলেন। ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, কোন্ ধরনের শরবত আপনার কাম্য? মেহমান বললেন, সেই শরবত, যেটা দুস্প্রাপ্যতার সময় প্রাণ থেকেও অধিক মূল্যবান এবং সহজলভ্যতার সময় একেবারে মূল্যহীন। ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) চাকরকে বললেন, মেহমান পানি চাচ্ছেন, ওনাকে পানি পান করাও। উপস্থিত সবাই ইমাম হাসনের উপলব্ধি করার ক্ষমতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেলেন। (মগনিল ওয়ায়েজীন ২১৮ পৃঃ)

সবকঃ পানি আল্লাহ তাআলার বড় মূল্যবান নেয়ামত। শেখ সাদী (রহমতুল্লাহ আলাইহে) বলেন, একটি মুরগীর দিকে লক্ষ্য করলে দেখা যায় যে এক ঢোক পানি পান করে সঙ্গে সঙ্গে মুখ আসমানের দিকে উঠায়। সম্ভবত এরকম করে আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে। কিন্তু আফসোস, অলস ব্যক্তিরা লাখ লাখ মন পানি পান করেও আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করে না।

কাহিনী নং ২৯৮

রক্তমাখা ছুরি

একদিন এক ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে হাজির করা হলো। লোকটিকে এক অনাবাদী জায়গা থেকে গ্রেপ্তার করা হয়েছিল। গ্রেপ্তারের সময় লোকটির হাতে একটি রক্তমাখা ছুরি ছিল এবং ওর সামনে রক্তরঞ্জিত মাটিতে একটি লাশ পড়ে রয়েছিল।

লোকটি হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সামনে দোষ স্বীকার করলে তিনি কেসাসের (মৃত্যুদণ্ডের) হুকুম দিলেন। এর পর পরই আর এক ব্যক্তি দৌড়ে এসে হযরত আলীর সামনে বললো.এ খুন আমি করেছি এবং এ জন্য আমিই প্রকৃত দোষী। হযরত আলী প্রথম ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কেন নিজেকে দোষী স্বীকার করলে? সে বললো, যে অবস্থায় আমাকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে,এতে শত অস্বীকার করলেও আমার কথা বিশ্বাসযোগ্য হতো না। ঘটনা জানতে চাইলে সে বললো, আমি হলাম একজন কসাই। আমি ঘটনার নিকটস্থ স্থানে একটি ছাগল জবেহ করেছিলাম এবং মাংসগুলো কেটে নিচ্ছিলাম। প্রস্রাবের হাজত হওয়ায় এক কিনারে প্রস্রাব করতে গেলাম। প্রস্রাব করে ফেরার পথে অদূরে একটি লাশের উপর আমার দৃষ্টি পড়লো। আমি সেটা দেখার জন্য কাছে গেলাম এবং দেখছিলাম। ইত্যবসরে পুলিশ আমাকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসে এবং সবাই বলছে যে আমি হত্যাকারী। আমি নিশ্চিত হয়ে গেলাম যে এতগুলো লোকের বক্তব্যের সামনে আমার বক্তব্য কোন পাত্তাই পাবে না। তাই নিজেকে দোষী স্বীকার করাটাই উত্তম মনে করলাম।

এবার দ্বিতীয় ব্যক্তিকে জিজ্ঞেস করলে, সে বল্লো, আমি একজন অভাবী বেদুইন। নিহত ব্যক্তিকে আমি জিনিস পত্রের লালসায় হত্যা করেছিলাম। কারো পায়ের আওয়াজ পেয়ে দৌড়ে এক কিনারে গিয়ে লুকিয়ে ছিলাম। ইত্যবসরে পুলিশ এসে প্রথম ব্যক্তিকে ধরে নিয়ে আসে। যখন আমি ওর মৃত্যুদণ্ডের কথা জানতে পারলাম তখন আমার মন অস্থির হয়ে উঠলো এবং নিজের দোষ স্বীকার করে এ নিরাপরাধ ব্যক্তিকে বাচানোর জন্য আমাকে উদ্ধুদ্ধ করলো।

এ কথা শুনে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পরামর্শ চাইলেন হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আমীরুল মুমেনীন! এ ব্যক্তি একজনকে হত্যা করলেও আর এক জনের জান বাচায়েছে। আল্লাহ তায়ালা ফরমান وَمَنْ اَحْيَاهَا فَكَاَنَّمَا اَحْيَا النَّاسَ جَمِيْعًا। অর্থাৎ যে ব্যক্তি একটি প্রাণ রক্ষা করলো,সে যেন অনেক মানুষকে জীবিত রাখলো।

হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এ পরামর্শ গ্রহণ করলেন এবং উভয়কে ছেড়ে দিলেন এবং নিহত ব্যক্তির খুনের বদলা বায়তুল মাল থেকে আদায়

করলেন।

(আল তুরকুল হেকমতে ফিস সিয়াসতিশ শরীয়া ৫৬ পৃঃ)

সবকঃ কোন ব্যাপারে রায় ঘোষণা করার সময় বিচারকের চিন্তাভাবনা করা এবং চিন্তাশীল ও বুদ্ধিমান ব্যক্তিদের পরামর্শ নেয়া উচিত। এ কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে, হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) বুদ্ধিমান ও মেধাশক্তির অধিকারী ছিলেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও জানা গেল যে বড়জন ছোট জনের কোন পরামর্শকে ভাল মনে করে গ্রহণ করলে, এতে বড়জন ছোট হয়ে যায় না।

কাহিনী নং ২৯৯

জান্নাতের আপেল

শৈশব কালে কোন একদিন হযরত ইমাম হাসন ও ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) তাঁদের নিজ নিজ সিলেটে কিছু লিখে একে অপরকে বলতে লাগলো-আমার লেখা তোমার লেখা থেকে সুন্দর। কেউ হার মানতে রাজি নয়। শেষ পর্যন্ত উভয়ে এ বিষয়ে রায় নেয়ার জন্য হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেলেন। হযরত মাওলা আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এ মোকদ্দমার নিষ্পত্তির দায়িত্ব হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দিলেন। হযরত ফাতেমা (রাদি আল্লাহু আনহা) বললেন, বাবুরা, এ বিষয়ের রায়টা তোমাদের নানাজান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে নিলে ভাল হয়। অতঃপর উভয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সমীপে হাজির হলেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তোমাদের ফায়সালা হযরত জিব্রাইল (আলাইহিস সালাম) করবেন। যথাসময়ে জিব্রাইল আমীন উপস্থিত হয়ে বললেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! এটার ফয়সালা আল্লাহ তাআলা নিজেই করবেন। অতঃপর আল্লাহ তায়ালা হযরত জিব্রাইলকে নির্দেশ দিলেন, জান্নাত থেকে একটি আপেল নিয়ে যাও এবং সেটা উভয়ের সিলেটের উপর দিয়ে গড়ায়ে দাও। আপেলটি যেই সিলেটের উপর থেমে যাবে সেই সিলেটের লিখাই উত্তম বলে বিবেচ্য হবে। সে মতে জিব্রাইল জান্নাত থেকে একটি আপেল এনে সিলেটদ্বয়ের উপর দিয়ে গড়ায়ে দিলেন। খোদার হুকুম, সেই আপেল দু'টুকরা হয়ে এক টুকরা হাসনের সিলেটের উপর, অপর টুকরা হোসাইনের সিলেটের উপর থেমে গেল। অতপর ফায়সালা এটাই হলো যে উভয়ের লিখা উত্তম।

(নজহাতুল মাজালিস ৩৯১ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হাসন ও ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর প্রতি আল্লাহ তাআলার বিশেষ কৃপাদৃষ্টি ছিল। আল্লাহ তাআলা তাঁর মাহবুবের নাতীদ্বয়ের মধ্যে কোন একজন মনঃকষ্ট পাক, সেটা চান নি। যারা এ শাহজাদাদ্বয়ের নামে বদনাম করে, তারা বড় জালিম।

কাহিনী নং ৩০০

ফিরিশতার ডিউটি

একবার শৈশব কালে হযরত ইমাম হাসন ও ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) ঘর থেকে বের হয়ে দীর্ঘক্ষণ ঘরে ফিরেনি। এতে হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হয়ে পড়লেন। ছেলেদ্বয় কোথাও হারিয়ে গেল কি না। ইত্যবসরে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ফাতিমার ঘরে তশরীফ আনলেন। হযরত ফাতিমা আরয করলেন, ইয়া রাসুলল্লাহ, আজ হাসন-হোসাইন হারিয়ে গেছে। কোথায় গেছে বলতে পারছিনা। একটু পরেই জিব্রাইল আমীন হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ, আপনার নাতীদ্বয় অমুক জায়গায় আছে। আপনি কোন চিন্তা করবেন না। আল্লাহ তাআলা ওনাদের দেখাশুনার জন্য একজন ফিরিশতা নিয়োজিত রেখেছেন। এটা শুনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই জায়গায় গেলেন। তিনি দেখতে পেলেন যে শাহজাদাদ্বয় আরামে শুইয়ে রয়েছেন এবং একজন ফিরিশতা ওর একটি ডানা ওনাদের নীচে বিছায়ে দিয়েছে এবং অপর ডানাটি দ্বারা ছায়াদান করে বসে রয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) উভয়ের মুখে চুমু দিলেন এবং সেখান থেকে উঠায়ে ঘরে নিয়ে আসলেন।

নজহাতুল মাজালিস ৩৯২ পৃঃ ২ জিঃ

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এ নাতীদ্বয় ফিরিশতাগণের কাছেও সম্মানিত ছিলেন। তাই ওনাদের প্রতি আন্তরিক মহব্বত রাখা এবং তাঁদের পদাঙ্ক অনুসরণ করে চলা মানবজাতির জন্য অপরিহার্য।

কাহিনী নং ৩০১

তৃষ্ণা নিবারণ

একদিন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত ইমাম হাসন ও ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর কান্নার আওয়াজ শুনলে তাড়াতাড়ি হযরত ফাতেমার ঘরে তশরীফ নিয়ে যান এবং হযরত ফাতিমাকে জিজ্ঞেস করেন, এরা কাঁদছে কেন? হযরত ফাতিমা আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ, এদের পানির তৃষ্ণা লেগেছে, ঘরে পানি নেই, তাই কাঁদছে। হুযূর ফরমালেন ওদেরকে এদিকে আন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) প্রথমে ইমাম হাসনকে কোলে উঠায়ে স্বীয় জিহবা মুবারক ওনার মুখে দিলেন। তিনি হুযূরের জিহবা চুষলেন এবং তৃষ্ণা নিবারণ করে শান্ত হয়ে গেলেন। অতঃপর ইমাম হোসাইনকে কোলে নিয়ে জিহবা মুবারক ওনার মুখে দিলেন। তিনিও জিহবা মুবারক চুষে তৃষ্ণা নিবারণ করে শান্ত হয়ে গেলেন। (হুজ্জাতুল্লাহে আলাল আলামীন ৬৮১ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হাসন ও হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) এর কোন প্রকার কষ্ট হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে অসহ্যনীয় ছিল। ওনারা কান্না করলে হুযূর খুবই দুঃখ পেতেন। যে সব জালিমরা হযরত হাসন-হোসাইনকে কষ্ট দিয়েছে, নিপীড়ন করেছে, তারা নিশ্চয়ই হুযূরকে কষ্ট দিয়েছে।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আপাদমস্তক মুজেজায় ভরপুর ছিল। তাঁর জিহবা মুবারক থেকে পানি বের করে নাতীদ্বয়ের তৃষ্ণা নিবারন করেছেন।

কাহিনী নং ৩০২

ভীতি ও বাহাদুরী

একদিন হযরত ফাতিমা (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত হাসন -হোসাইনকে নিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হলেন এবং আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ এদেরকে কিছু দান করুন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, হ্যাঁ নিশ্চয় করবো। আমি আমার জ্ঞান ও খোদাভীতি হাসনকে এবং বীরত্ব ও করুণা হোসাইনকে দান করলাম।

(ইবনে আসাকের - আল আমন ওয়াল উলা - ৯১ পৃঃ)

সবকঃ হাসন -হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহুমা) ভীতি, বীরত্ব, জ্ঞান ও করুণার অধিকারী ছিলেন। এ বিষয়গুলো তাঁদের নানাজান থেকে পেয়েছে। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) আল্লাহর অনুমতিক্রমে আল্লাহর ধন ভাণ্ডারের মালিক। এ ক্ষমতা বলেই তিনি তাঁর নাতীদ্বয়কে ভীতি, বীরত্ব , জ্ঞান ও করুণা দান করেছেন।

কাহিনী নং ৩০৩

এক অদ্ভুত স্বপ্ন

ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এক রাত্রে স্বপ্ন দেখলেন যে তাঁর দু'চোখের মধ্যবর্তী স্থানে قُلْ هُوَ اللّٰهُ اَحَدٌ লিখিত আছে। তাঁর পরিবারের লোকেরা এ স্বপ্ন শুনে খুবই খুশী হলেন। কিন্তু যখন এ স্বপ্নের কথা হযরত সাঈদ বিন মসয়ব (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে বর্ণনা করা হলো, তখন তিনি বললেন, যদি বাস্তবিকই এ রকম স্বপ্ন দেখে থাকে তাহলে ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জীবনকাল মাত্র কয়েকদিন বাকী আছে। এ তাবীর সঠিক প্রমাণিত হলো। কয়েক দিন পর দুশমনেরা তাঁকে বিষ পান করায়ে শহীদ করে দেয়।
(তারিখুল খোলাফা ১৩০ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) দুশমনদের দুশমনীতে শাহাদত বরণ করেন। তাঁর শাহাদতের ইঙ্গিত আগে থেকেই স্বপ্নযোগে জানা হয়ে গিয়েছিল।

কাহিনী নং ৩০৪

গোপনীয়তা সংরক্ষণ

হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে দুশমনেরা ষড়যন্ত্র করে বিষ পান করালে তাঁর পাতলা পায়খানা শুরু হয় এবং পায়খানার সাথে পেটের নাড়িভূড়ি টুকরা টুকরা হয়ে বের হতে থাকে। এ অবস্থায় চল্লিশদিন খুবই কষ্টের মধ্যে অতিবাহিত করেন। মৃত্যু সায়াহ্নে তাঁর প্রিয় ভাই ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) জানতে চাইলেন যে তাঁকে কে বিষ প্রয়োগ করেছে। তিনি বললেন, তুমি

কি ওকে হত্যা করবে? হযরত হোসাইন বললেন, নিশ্চয় হত্যা করবো। ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, যার প্রতি আমার সন্দেহ,সত্যিই যদি সে হয়ে থাকে, তাহলে আল্লাহ তায়ালাই তার প্রতিশোধ নিবেন। তিনিই আসল প্রতিশোধ গ্রহণকারী এবং তাঁর ধরা খুবই কঠিন। আর যদি সে না হয়ে থাকে, তাহলে আমি চাইনা যে আমার দ্বারা কোন নিরাপরাধ ব্যক্তি বিপদগ্রস্ত হোক।
(তারিখে খোলাফা ১৩৪ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) মৃত্যু শয্যায় শায়িত অবস্থায়ও ইনসাফ ও ন্যায় নীতির উপর অটল ছিলেন। মারাত্মক কষ্ট ভোগ করার পরও যার প্রতি সন্দিহান ছিলেন, ওর নাম উল্লেখ করেন নি। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)ও কাউকে হত্যাকারী সাব্যস্ত করেননি। আজ যারা নিজেরাই মনগড়া গবেষণা করে ইমাম হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর হত্যাকারী নির্ধারণ করে, তাঁরা সীমা লঙ্ঘনকারী।

কাহিনী নং ৩০৫

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত আব্বাসের স্ত্রী হযরত উম্মুল ফজল (রাদি আল্লাহু আনহা) এক রাত্রে স্বপ্নে দেখলেন যে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পবিত্র শরীরের একটি অংশ তাঁর কোলে রাখা হয়েছে। এ স্বপ্ন দেখে তিনি অস্থির হয়ে পড়েন এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর খেদমতে হাজির হয়ে আরয করলেন, ইয়া রাসুলাল্লাহ! আমি এক অদ্ভুত স্বপ্ন দেখেছি। সেটা হচ্ছে, আপনার পবিত্র শরীরের একটি অংশ আমার কোলের উপর দেখেছি। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, তুমি খুবই ভাল স্বপ্ন দেখেছ। ইনশা আল্লাহ আমার ফাতেমার ঘরে একটি সন্তান জন্ম হবে, যেটা তোমার কোলে স্থান পাবে। ঠিকই হযরত ফাতেমার ঘরে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) জন্ম হন এবং উম্মুল ফজলের কোলে স্থান পান। (মিশকাত শরীফ ৫৬৪ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কলিজার টুকরা ছিল। তাই ওনাকে মহব্বত করা মানে হুযূরকে মহব্বত করা এবং ওনাকে কষ্ট দেয়া মানে হুযূরকে কষ্ট দেয়া।

কাহিনী নং ৩০৬

ইমাম হোসাইন ও এক যাযাবর

এক যাযাবর হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে আরয করলেন, আমি আপনার নানা অর্থাৎ নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে শুনেছি যে কোন প্রয়োজনে যেন চার ধরনের ব্যক্তির যে কোন এক ধরনের ব্যক্তির কাছে ধর্না দেয়া হয়। এ চার ধরনের ব্যক্তি হচ্ছে-কোন সম্ভ্রান্ত আরবী লোক বা কোন সম্ভ্রান্ত সরকার অথবা কোন হাফেজে কুরআন বা কোন সুন্দর ব্যক্তি। এ চারটা বৈশিষ্ট্যই আপনার মধ্যে পরিপূর্ণভাবে বিদ্যমান। কারণ সমগ্র আরবের শরাফত আপনার কারণেই অর্জিত হয়েছে। দানশীলতা আপনার ব্যক্তিগত গুণ, কুরআনতো আপনার ঘরেই অবতীর্ণ হয়েছে এবং সৌন্দর্যের ব্যাপারে কি আর বলবো; আপনার নানা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমাতেন, তোমরা আমাকে দেখতে চাইলে হাসন-হোসাইনকে দেখে নাও।

যাযাবরের এ কথা শুনে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন- তোমার কি প্রয়োজন বল। যাযাবর স্বীয় প্রয়োজনীয় বিষয় মাটিতে লিখে জানালো। এর উত্তরে হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আমি আমার নানাজান থেকে শুনেছি যে নেকী আধ্যাত্মিক জ্ঞান অনুসারে হয়ে থাকে। আমি তোমাকে তিনটি প্রশ্ন জিজ্ঞেস করবো। যদি তুমি এ তিনটি প্রশ্নের একটির জবাব দিতে পার, তাহলে এ থলির এক তৃতীয়াংশ তোমাকে প্রদান করা হবে। যদি দু'টি উত্তর দিতে পার তাহলে এ থলির দু'অংশ তুমি পাবে। আর যদি তিনটি প্রশ্নের উত্তর দিতে পার তাহলে পুরা থলি তোমাকে দেয়া হবে। যাযাবর বললো, ঠিক আছে, জিজ্ঞেস করুন। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) জিজ্ঞেস করলেন, সমস্ত আমলের মধ্যে কোন্ আমল শ্রেষ্ঠ? সে উত্তর দিল, খোদার উপর ঈমান আনা। তিনি জিজ্ঞেস করলেন। ধ্বংস থেকে মানুষের মুক্তি কি জিনিসের উপর নির্ভর? উত্তর দিল, খোদার উপর ভরসা করা। পুনরায় প্রশ্ন করলেন, কি জিনিস দ্বারা বান্দার সৌন্দর্য বৃদ্ধি পায়? উত্তর দিল, জ্ঞানের দ্বারা, যার সাথে ধৈর্য ও সহনশীলতাও থাকা চায়। ইমাম হোসাইন বললেন, যদি কারো কাছে এ গুণ না থাকে? বললো, ওর কাছে সেই জিনিস থাকা চায়, যেটা থেকে দান করা যায়। তিন বললেন, যদি কারো কাছে এ রকম সম্পদ না থাকে? বললো, ওর জন্য দগ্ধকারী বিদ্যুতের প্রয়োজন।

হযরত ইমাম হোসাইন এ কথা শুনে হেসে দিলেন এবং যাযাবরকে পূর্ণ থলি দিয়ে দিলেন।

(নজহাতুল মাজালিস ৩৯৩ পৃঃ ২ জিঃ)

সবক ঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের কাছে হাজত পেশ করা নবীর নির্দেশ। আল্লাহ ওয়ালাগণ হাজত পূর্ণ করেন। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় উদার ও দানশীল ছিলেন।

কাহিনী নং ৩০৭

কারবালার সম্মুখে

একদিন হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কোলে ছিলেন এবং হযরত উম্মুল ফজলও পাশে বসা ছিলেন। হযরত উম্মুল ফজল হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দিকে তাকালে দেখতে পান যে তাঁর চক্ষুদ্বয় থেকে অঝোরে অশ্রু প্রবাহিত হচ্ছে। উম্মুল ফজল আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! হঠাৎ চোখের পানি কেন? হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, এ মাত্র জিব্রাইল এসে আমাকে খবর দিয়েছে যে আমার এ শিশুকে আমার উম্মত হত্যা করে ফেলবে। জিব্রাইল আমাকে সেই জমীনের লাল মাটিও এনে দিয়েছেন যেখানে আমার এ শিশু শহীদ হবে।

হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) সেই মাটি শুঁকে দেখলেন এবং বললেন, এ মাটি থেকে আমি কারবালার সুঘ্রাণ পাচ্ছি। অতঃপর সেই মাটি উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাদি আল্লাহু আনহা) কে দিলেন এবং বললেন, হে উম্মে সালমা, এ মাটি তোমার কাছে রেখো। যখন এ মাটি রক্ত হয়ে যাবে তখন বুঝিও যে আমার এ নানু শহীদ হয়ে গেছে। হযরত উম্মে সালমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এ মাটি একটি শিশিতে ভরে যত্ন সহকারে রেখে ছিলেন। যে দিন হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে শহীদ হন, সেই দিন এ মাটি মুখবন্ধ শিশিতে রক্তে রূপান্তরিত হয়ে গিয়েছিল।

(মিশকাত শরীফ ৫৬৪ পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে তাঁর কলিজার টুকরা হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদতের কথা জানা ছিল।

শাহাদতের স্থানের কথাও জানা ছিল। মোটকথা তাঁর কাছে কোন কিছু অজানা ছিল না। হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর এটাও জানা ছিল যে হযরত উম্মে সালমা হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদতের পরও জীবিত থাকবেন। সে জন্যই সেই মাটি ওনার হেফাজতে দিয়েছিলেন। এত কিছুর পরও কেউ যদি হুযূরের অদৃশ্য জ্ঞানের ব্যাপারে সন্দেহ করে, ওর থেকে বড় জাহিল আর কে হতে পারে?

কাহিনী নং ৩০৮

বীরত্বপূর্ণ জবাব

হযরত আমীরে মুয়াবীয়া (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ইন্তেকালের পর যখন ইয়াজিদ সিংহাসনে বসলো, তখন সে তার আনুগত্যের জন্য চারিদিকে বিভিন্ন জায়গায় চিঠি পাঠালো এবং মদীনা মনোয়ারার প্রশাসককেও চিঠি লিখলো যেন ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ইয়াজিদের আনুগত্য স্বীকার করতে বলে। যখন মদীনার প্রশাসক ইমাম হোসাইনের খেদমতে হাজির হয়ে ইয়াজিদের বায়াতের কথা বলে, তখন ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ইয়াজিদকে তার দুষ্কর্মের জন্য খিলাফতের অনুপযুক্ত বলে অভিমত ব্যক্ত করলেন এবং কক্ষনো এ জালিমের আনুগত্য স্বীকার করবেন না বলে প্রশাসককে জানিয়ে দিলেন। প্রশাসক এ জবাব শুনে চলে গেল। ইয়াজিদের কানে এ খবর পৌঁছলে সে ভীষণ ক্ষেপে যায়। (সিররুশ শাহাদাতাইন- ১৩-পৃঃ)

সবকঃ ইয়াজিদ বড় ফাসিক ও ফাজির ছিল। তার এ চরিত্রের কারণে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তার বায়াত করতে অস্বীকার করেন। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বাহাদুরের ছেলে বাহাদুর ছিলেন। তিনি এটা জানতেন তাঁর অস্বীকৃতিতে ইয়াজিদ তেলেবেগুনে জ্বলে উঠবে এবং নির্মমভাবে প্রতিশোধ নিতে তৎপর হবে। তবুও হক কথা বলতে দ্বিধাবোধ করেননি এবং জান রক্ষার জন্য বাস্তবকে গোপন করেন নি।

কাহিনী নং ৩০৯

রাওজা পাকে হাজেরী

ইয়াজিদ যখন এ কথা জানতে পারলেন যে ইমাম হোসাইন ওর বায়াত করেন নি, তখন সে খুবই রাগান্বিত হয়ে মদীনার প্রশাসককে কড়া নির্দেশ দিল যে ইমাম

হোসাইনকে ওর বায়াত করার জন্য যেন চাপ সৃষ্টি করে । বায়াত না করলে ওনার মাথা কেটে ওর কাছে যেন পাঠিয়ে দেয়া হয়। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ইয়াযিদের এ নির্দেশের কথা জানতে পেরে মদীনা মনোয়ারা ত্যাগ করে মক্কা মোয়াজ্জমা চলে যাবার মনস্থ করলেন। মদীনা ত্যাগের পূর্ব রাত্রে তাঁর নানাজান হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর রওজা পাকে হাজির হলেন এবং রাওজা পাক জড়িয়ে ধরে কেঁদে কেঁদে ইয়াজিদের আচরণের বর্ণনা দিতে লাগলেন। এ অবস্থায় হঠাৎ তাঁর চোখ লেগে আসলে তিনি স্বপ্ন দেখেন যে নানা জান তশরীফ এনেছেন, তাঁকে চুমু দিলেন এবং বুকে জড়িয়ে ধরলেন। অতঃপর বললেন, প্রিয় হোসাইন শীঘ্রই জালিমেরা তোমাকে কারবালা ময়দানে ভূখা ও তৃষ্ণার্থ অবস্থায় শহীদ করবে। তোমার মা-বাবা ও ভাই তোমার অপেক্ষায় আছে। তোমার জন্য বেহেস্ত নতুনভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে। তথায় এমন সম্মানিত উচ্চ স্থান রয়েছে যেটা শহীদ হওয়া ব্যতীত তুমি পেতে পার না। যাও বেটা যাও, সবর ও ধৈর্য সহকারে শাহাদাত বরণ করে আমার কাছে এসে যাও। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) জাগ্রত হওয়ার পর ঘরে আসলেন এবং আহলে বায়তের সবাইকে একত্রিত করে এ স্বপ্ন শুনালেন এবং মদীনা ত্যাগের চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত নিয়ে নিলেন। অতঃপর ভাই এর মাযারে গিয়ে বিদায় নিলেন। এরপর মায়ের কবরের কাছে গিয়ে আরয করলেন- আম্মাজান আজ তোমার হোসাইন তোমার থেকে বিদায় নিতে এসেছে এবং আখেরী সালাম পেশ করছে। পবিত্র কবর থেকে আওয়াজ আসলো, ওয়া আলাইকুমুস সালাম ওহে আমার মজলুম বৎস। তিনি ওখানে দাঁড়িয়ে অনেকক্ষণ কাঁদলেন। অতঃপর ওখান থেকে ফিরে এসে মক্কা মুয়াজ্জমার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন।

(তাজকিরায়ে হোসাইন - ২৭ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজেও তাঁর শাহাদতের কথা জানতেন। তা সত্বেও তাঁর মনোভাবের মধ্যে কোন পরিবর্তন আসেনি এবং শাহাদতের উৎসাহে কোন কমতি দেখা যায়নি। বরং উৎসাহ আরও বৃদ্ধি পেয়েছে। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জীবনী থেকে জানা যায় যে আল্লাহর রেজামন্দীকামীরা আল্লাহর মর্জির উপর নিজেদেরকে উৎসর্গ করে দেয়াতেই তাঁরা স্বস্তি ও বাস্তব শান্তনা পান। তাঁরা অস্থির হয়ে নির্দিষ্ট সময়ের অপেক্ষায় থাকেন।

কাহিনী নং- ৩১০

কূফাবাসীর চিঠি

হযরত আমীরে মুয়াবিয়া (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) এর ওফাতের পর ইয়াজিদ সিংহাসনে বসলো। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) ওর বায়াত করলেন না। কূফাবাসীরা যখন জানতে পারলো যে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) ইয়াযিদের বায়াত করেননি এবং মক্কা মুয়াজ্জমায় চলে গেছেন, তখন কূফাবাসীরা একমত হয়ে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) এর কাছে এ অভিমত ব্যক্ত করে চিঠি লিখলো যে আমরা আপনার জন্য জান-মাল কুরবানী দিতে প্রস্তুত। আপনি কূফায় তশরীফ আনুন। আমরা আপনার বায়াত করে আপনার নির্দেশে জালিমদের মোকাবিলা করবো এবং যে কোন অবস্থায় আপনার সাথে থাকবো। এ ধরনের চিঠি অনবরত আসতে লাগলো। প্রায় দেড়শ মত চিঠি এসে পৌঁছলো। এ ধরনের লাগাতার চিঠি আসতে থাকায় তিনি নিশ্চুপ থাকতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত তিনি উত্তর দিলেন যে তোমাদের প্রেরিত প্রায় দেড়শ চিঠি পেয়েছি। তোমাদের সত্যিকার মনোভাব জানার জন্য আমার চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে তোমাদের কাছে পাঠাচ্ছি। তোমরা যদি সত্যিই আমার সমর্থক হও, তাহলে আমার প্রতিনিধি মুসলিমের হাতে বায়াত কর। যখন সে তোমাদের মনোভাব ও আন্তরিকতার কথা আমাকে জানাবে, তখন আমিও ইনশাআল্লাহ তোমাদের কাছে পৌঁছে যাব।

(সিররুশ শাহাদাতাইন - ১৪ পৃঃ)

সবকঃ কূফাবাসীদের বেওফায়ীর কথা প্রসিদ্ধ হওয়া সত্বেও হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) তাদের চিঠিগুলোকে গুরুত্ব এ জন্য দিলেন যে যেন কিয়ামতের দিন ওরা এ রকম বলতে না পারে– আমরা জালিমদের মোকাবিলা ও তাদের থেকে বাঁচার জন্য আগ্রহী ছিলাম। কিন্তু হযরত আলীর ছেলে হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) আমাদের আবেদনে সাড়া দেননি। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) দলীল স্থাপন করার জন্য স্বীয় চাচাতো ভাইকে পাঠালেন এবং স্বীয় দায়িত্ব পালন করার জন্য তৈরী হয়ে গেলেন।

কাহিনী নং - ৩১১

বার হাজার

কূফাবাসীদের অনবরত আহ্বানে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) কূফা যাবার জন্য মানসিক প্রস্তুতি নিয়া নিলেন। কিন্তু বাস্তব অবস্থা জানার জন্য তাঁর চাচাতো ভাই মুসলিম বিন আকিলকে সেখানে পাঠালেন এবং ওনাকে বললেন, তুমি ওখানে গিয়ে কূফাবাসীদেরকে আমার নামে বায়াত করতে বলিও। তারা বায়াত করলে আমাকে অবহিত করিও। এ খবর পাওয়ার পর আমিও তথায় গমন করবো। সেমতে হযরত মুসলিম বিন আকিল তাঁর অল্পবয়স্ক দু'শিশুকে নিয়ে কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে গেলেন। তাঁর ছেলেদ্বয়ের নাম ছিল মুহাম্মদ ও ইব্রাহীম। তাঁরা তাঁদের বাপকে খুবই ভালবাসতেন। এ জন্য তাঁরাও বাপের সফরসঙ্গী হলেন। হযরত মুসলিম কূফা পৌঁছে মুখতার বিন ওবাইদের ঘরে অবস্থান নিলেন। তাঁর আগমনের খবর পেয়ে দলে দলে লোক আস্‌তে লাগলো এবং বার হাজারের অধিক লোক তাঁর হাতে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) এর নামে বায়াত গ্রহণ করলো। হযরত মুসলিম কূফাবাসীর একান্ত আগ্রহ ও দৃঢ় আস্থা দেখে সেখানকার অবস্থার কথা অবহিত করে ইমাম হোসাইনের কাছে এ মর্মে চিঠি লিখলেন যে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব চলে আসুন, এখানকার অবস্থা খুবই সন্তোষজনক। জনসাধারণ ইয়াযিদের কুশাসন থেকে মুক্ত হবার জন্য এবং সঠিক ধর্মের উপর অটল থাকতে দৃঢ় প্রতিজ্ঞ।

সিররুশ শাহাদাতাইন–১৪ পৃঃ)

সবকঃ আহলে বায়তের একমাত্র উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে আল্লাহর বান্দাগণ যেন শরীয়ত বিরোধী আইন কানুন থেকে রক্ষা পায় এবং সত্য ধর্মের উপর অটল থাকতে পারে। হকপন্থীগণ সব সময় এ আদর্শের উপর অটল ছিলেন।

কাহিনী নং- ৩১২

জাল্লাদ ইবনে যিয়াদ

হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) যখন কূফায় পৌঁছলেন, তখন সাথে সাথে বার হাজারের অধিক কূফাবাসী তাঁর হাতে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্‌হু) এর নামে বায়াত গ্রহণ করে। এ অবস্থা দেখে তিনি ইমাম

হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্হু)কে সহসা চলে আসার জন্য চিঠি লিখেন। এ দিকে ইয়াযিদ যখন এ অবস্থার কথা জানতে পারলো, তখন সে বসরার গভর্ণর ওবাইদুল্লাহ বিন যিয়াদের কাছে ফরমান পাঠালো যেন কালবিলম্ব না করে কূফায় এসে লোকদেরকে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আন্হু) এর বায়াত গ্রহণ থেকে বাঁধা দেয় এবং যারা ইতোমধ্যে বায়াত গ্রহণ করেছে, তাদেরকে ধমকি ও হুমকির মাধ্যমে ফিরায়ে আনে। ইবনে যিয়াদ বড় ধোঁকাবাজ ও খুনী ছিল। এ জালিম কূফা এসে নানা ভয় ভীতির মাধ্যমে কূফাবাসীকে ইয়াযিদের বিরোধীতা থেকে বিরত থাকতে বললো এবং নানা লোভ দেখায়ে ওদেরকে ইমাম হোসাইনের সহায়তা করা থেকে বাঁধা দিল। এতে সে সফল হলো এবং সকলের মনে প্রভাব ও ভীতি সৃষ্টি করতে সক্ষম হলো।

হযরত ইমাম মুসলিম এ অবস্থা দেখে রাত্রে হানী বিন আরওয়ার ঘরে গেলেন এবং বললেন, হানী, আমি গরীব মুসাফির। তুমিতো কূফাবাসী সম্পর্কে ভালমতে অবহিত। আমি তোমার আশ্রয়ে তোমার ঘরে থাকতে চাই। হানী ওনাকে সানন্দে গ্রহন করলেন এবং একটি কামরা খালি করে দিলেন।

ইবনে যিয়াদ যখন জানতে পারলো যে ইমাম মুসলিমকে হানী আশ্রয় দিয়েছে, তখন সে সৈন্য পাঠিয়ে হানীকে গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসলো। অনুরূপভাবে কূফায় অন্যান্য সরদার ও গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরও কিল্লায় নজরবন্দি করলো। হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আন্হু) এ খবর জানতে পেরে ভীষণ উত্তেজিত হয়ে উঠলেন, তাঁর শীরা উপশীরায় হাশেমী রক্ত উৎলিয়ে উঠলো। তিনি তাঁর ছেলেদ্বয়কে কাজী শরীহের ঘরে পাঠিয়ে দিলেন এবং আহলে বায়তের ভক্ত অনুরক্তদেরকে আহ্বান করলেন। তাঁর এ আহ্বানে দলে দলে লোক আসতে লাগলেন। অল্প সময়ের মধ্যে চল্লিশ হাজারের মত লোক জমায়েত হয়ে গেল। এদেরকে নিয়ে তিনি রাজ প্রসাদ ঘেরাও করলেন। ইবনে যিয়াদ ও তাঁর সহচররা গ্রেপ্তার হওয়ার পর্যায়ে পৌঁছে গিয়েছিল। কালবিলম্ব না করে ধুরন্ধর ইবনে যিয়াদ একটি চালবাজি করলো। সে কিল্লায় নজরবন্দীকৃত কূফার সরদারদেরকে বাধ্য করলো যে ওরা যেন ছাদে উঠে কূফাবাসীদেরকে বুঝায়, ভয় দেখায় যাতে ইমাম মুসলিমকে ত্যাগ করে চলে যায়। এ লোকেরা মনে করলো যে তারা একেতঃ ইবনে যিয়াদের হাতে বন্দী, তাছাড়া ইবনে যিয়াদের পরাজয় হলেও কিল্লা দখল করার আগে তাদেরকে খতম করে দিবে। এ ভয়ে তারা তাড়াতাড়ি ছাদে উঠে

তাদের আত্মীয় স্বজনকে ডাক দিয়ে বললো, ইমাম মুসলিমের সহায়তা করা তোমাদের জন্য বিপজ্জনক হবে। সরকার তোমাদের উপর ক্ষেপে যাবে, ইয়াযিদ তোমাদের সন্তান-সন্ততিদেরকে মেরে ফেলবে। তোমাদের ঘর বাড়ী লুণ্ঠন করবে, জায়গা-জমি বাজেয়াপ্ত করবে, আমাদেরকে কিল্লার অভ্যন্তরে খতম করে দেবে। তাই তোমাদের ও আমাদের ভয়াবহ পরিণতির কথা স্মরণ করে ঘরে চলে যাও। ইবনে যিয়াদের এ চাল কাজে আসলো। হযরত ইমাম মুসলিমের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল। সবাই এদিক সেদিক হয়ে চলে গেল। সন্ধ্যার আগে দেখা গেল যে চল্লিশ হাজারের মধ্যে মাত্র পাঁচশ জন আছে। সূর্য ডুবার পর একটু অন্ধকার হয়ে আসলে এ পাঁচশজনও চলে গেল।

(সিররুশ শাহাদাতাইন - ১৬ পৃঃ

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ও আহলে বায়তের প্রতি মহব্বত ও ওফাদারীর দাবীদার কূফাবাসীদের সমস্ত ওয়াদা প্রতিজ্ঞা মিথ্যা ছিল। তারা যথাসময়ে বেওফা হিসেবে প্রমাণিত হলো। আহলে বায়তের প্রতি মহব্বতের দাবীদার সবাই সত্যবাদী নয়।

কাহিনী নং ৩১৩

ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদত

হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন কূফায় পৌঁছেন, তখন বেওফা কূফাবাসীরা তাঁর হাতে বায়াত করে। পরবর্তীতে তাঁর থেকে মুখ ফিরায়ে নেয়, তাঁর সঙ্গ ত্যাগ করে। তিনি একাকী হয়ে যান। সময়টা ছিল রাত্রি বেলা, ইবনে যিয়াদ তাঁকে গ্রেপ্তার করার জন্য শহরের চারিদিকে কড়া পাহারার ব্যবস্থা করলো। হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু) ক্ষুধা-তৃষ্ণার্ত অবস্থায় একটি মসজিদে অনেকক্ষণ বসে থাকার পর রাত্রির অন্ধকারে বের হলেন। পথ ঘাট সম্পর্কে তিনি মোটেই অবগত ছিলেন না। মনে মনে বলছিলেন, আফসোস, হোসাইন থেকে আলাদা হয়ে শত্রুদের মধ্যে এসে পড়লাম। মনের কথা শুনার মত কোন দরদী ব্যক্তি নেই। এমন কোন বার্তাবাহকও নেই যিনি আমার দুর্দশার খবর ইমাম হোসাইনকে পৌছাবে।

এভাবে হয়রান পেরেশান হয়ে মহল্লার অলিগলিতে ঘুরছিলেন। ওখানে 'তুয়া'

নামে এক বৃদ্ধাকে দেখে ওর কাছে পানি চাইলে, বৃদ্ধা পানি পান করালো এবং পরিচয় পাওয়ার পর ওনাকে ঘরে আশ্রয় দিল। এ বৃদ্ধার ছেলে ইবনে যিয়াদের দালাল ছিল। সে এ খবর ইবনে যিয়াদের কানে পৌঁছালে ইবনে যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে সৈন্য পাঠিয়ে দিল। সৈন্যরা এ বৃদ্ধার ঘর চারিদিক থেকে ঘিরে ফেললো এবং ইমাম মুসলিমকে গ্রেপ্তার করার প্রস্তুতি নিল। ইমাম মুসলিম যখন টের পেলেন তখন তিনি খোলা তলোয়ার নিয়ে ইবনে যিয়াদের সৈন্যদের উপর আক্রমন করলেন। ছাগলের পালের মধ্যে বাঘের আক্রমনের মত তিনি ঝাঁপিয়ে পড়লেন, সৈন্যরা হুঁশ জ্ঞান হারিয়ে এদিক সেদিক পালিয়ে গেল, অনেকেই মারা গেল এবং অনেকেই আহত হলো। এ কাপুরুষেরা সম্মুখ আক্রমনে দাঁড়াতে না পেরে দূর থেকে দেয়ালে উঠে পাথর নিক্ষেপ করতে লাগল। পাথরের আঘাতে ইমাম মুসলিমের শরীর জর্জরিত হয়ে গেল। একটি পাথর তাঁর কপালে এসে পড়লে সেখান থেকে ফিন্‌কি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। সেই সময় তিনি মক্কার দিকে তাকিয়ে বলতে লাগলেন-

'হে হোসাইন, আপনার ভাই আঘাতে আঘাতে জর্জরিত এবং কূফাবাসী কি ধরনের আচরণ শুরু করেছে এ খবরতো আপনি এখনও পাননি। আফসোস, এ মর্মান্তিক খবর আপনাকে কে পৌঁছাবে এবং আপনাকে এখানে আসা থেকে কে বাঁধা দেবে।'

এ ফাঁকে আর একটি পাথর এসে তাঁর ঠোট ও দাঁতের উপর পড়লো। এতে তাঁর মুখ থেকে রক্ত বের হতে লাগলো। দাড়ি মুবারক রক্তে লাল হয়ে গেল। শেষ পর্যন্ত তিনি দুর্বল হয়ে একটি দেয়ালে হেলান দিয়ে বসে গেলেন। এ সুযোগে এক কাপুরুষ ঘরের ভিতর দিয়ে এসে তাঁর মাথায় তলোয়ারের আঘাত করলো। এতে তাঁর উপরের ঠোঁট কেটে গেল। এ অবস্থায় তিনি ওকে এক আঘাতে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেখানে বসেই রইলেন এবং আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ করতে লাগলেন, হে আল্লাহ! আমি বড় তৃষ্ণার্থ। তাঁর এ ফরিয়াদ শুনে সেই বৃদ্ধা ঘর থেকে এক গ্লাস পানি এনে দিল। তিনি গ্লাসে মুখ দিলে পানি রক্ত মিশ্রিত হয়ে লাল হয়ে গেল। তিনি সেই পানি ফেলে দিলে বুড়ি পুনরায় আর এক গ্লাস পানি দিল। সেটাও রক্ত মিশ্রিত হয়ে গেল। তৃতীয় বার এনে দিলে সেটাতে মুখ দিতেই তাঁর দাঁত ঝড়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত 'আল্লাহর ইচ্ছা নেই' -এ বলে পানির গ্লাস হাত থেকে রেখে দিলেন। এরই মধ্যে পিছন থেকে কোন একজন

তীর নিক্ষেপ করলো, সেটা তার পিঠে বিদ্ধ হলো। এতে তিনি কাবু হয়ে গেলেন। জালিমেরা এ সুযোগে দৌড়ে এসে তাঁকে ধরে ফেললো এবং ইবনে যিয়াদের কাছে নিয়ে গেল। নরাধম ইবনে যিয়াদ নির্দেশ দিল যে তাঁকে ছাদে নিয়ে যেন হত্যা করা হয়। ইবনে কবির নামে এক জালিম তাঁর হাত ধরে ছাদে নিয়ে গেল। যাবার পথে তিনি দরূদ শরীফ পাঠ করছিলেন এবং বলছিলেন-

اَللّٰهُمَّ احْكُمْ بَيْنَنَا وَبَيْنَ قَوْمِنَا بِالْحَقِّ

ছাদে গিয়ে দেখলেন যে নীচে কূফাবাসীরা সমবেত হয়ে এ দৃশ্য দেখতেছে। তিনি ওদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে কূফাবাসী, যখন আমার মস্তক শরীর থেকে আলাদা করে ফেলবে, তখন আমার দেহটা দাফন করিও এবং আমার শরীরের রক্তার্ত কাপড়টা খুলে মক্কাগামী কোন কাফেলাকে দিও যেন ইমাম হোসাইনকে পৌঁছায় এবং আমার ছেলেদ্বয়ের প্রতি একটু দয়া করিও। অতঃপর মক্কার দিকে তাকিয়ে বললেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَابْنَ رَسُوْلَ اللّٰه ভাই, আপনাকেতো আমার এ খবর পৌঁছাতে পারলাম না। আপনি এদিকে আসার সিদ্ধান্ত কক্ষনো নিবেন না। ইত্যবসরে জাল্লাদ দেহ থেকে তাঁর মস্তক আলাদা করে ফেললো। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ শত জুলুম অত্যাচারের পরও স্বীয় বিশ্বাসে অটল থাকেন। কোন কিছু তাঁদেরকে টলাতে পারে না। কাপুরুষরা কখনও স্বীয় সিদ্ধান্তে অটল থাকতে পারে না। কুফার সেই কাপুরুষেরা প্রথমে আহলে বায়তের মহব্বতে গদ গদ করে উঠে। পরে ইবনে যিয়াদের হুমকিতে আহলে বায়তের জানের দুশমন হয়ে যায়।

কাহিনী নং ৩১৪

মজলুম ছেলেদ্বয়

হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু) কূফা যাবার সময় তাঁর আদরের শিশু সন্তান হযরত ইব্রাহীম ও হযরত মুহাম্মদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা)কেও সাথে নিয়ে গিয়েছিলেন। ইবনে যিয়াদ ইমাম মুসলিমকে কতলের পর জানতে পারলো যে ইমাম মুসলিমের দু'ছেলে এ শহরে রয়েছে। ইবনে যিয়াদ সঙ্গে সঙ্গে ফরমান জারী করলো যে, যে মুসলিমের ছেলেদ্বয়কে ঘরে স্থান দিবে ওকে কতল করা

হবে। এ সময় ছেলেদ্বয় কাজী শরীহের ঘরে ছিল। কাজী সাহেব ছেলেদ্বয়কে সামনে ডাকলেন এবং অঝোরে কাঁদতে লাগলেন। ছেলেদ্বয় জিজ্ঞেস করলেন, জনাব, আপনি কাঁদছেন কেন? আমরা কি এয়াতীম হয়ে গেছি? কাজী সাহেব কান্না সংবরণ করে বললেন, আল্লাহ তোমাদেরকে ধৈর্য দান করুক, বাস্তবিকই তোমরা এয়াতীম হয়ে গেছ। এ খবর শুনে শিশুদ্বয় চিৎকার দিয়ে কেঁদে উঠলো। কাজী সাহেব ওদেরকে শান্তনা দিয়ে বললেন, বাবারা নিশ্চুপ থেকো.ইবনে যিয়াদের লোকেরা তোমাদের তালাশে আছে, আমি আমার ও তোমাদের নিরাপত্তার ভয় করছি। আমি তোমাদেরকে কারো সাথে মদীনা মনোয়ারা পাঠিয়ে দিতে মনস্থ করেছি। ছেলেদ্বয় এ কথা শুনে ইবনে যিয়াদের ভয়ে চুপ হয়ে গেল।

কাজী সাহেব তাঁর ছেলে আসাদকে ডেকে বললেন, আজ একটি কাফেলা ইরাকী গেইট দিয়ে মদীনা যাচ্ছে। তুমি ছেলেদ্বয়কে নিয়ে কাফেলার কোন একজন ভাল মানুষের হাতে দিয়ে এসো যেন ওদেরকে মদীনায় পৌঁছায়ে দেয়। আসাদ যখন ছেলেদ্বয়কে নিয়ে ইরাকী গেইটে গেল, তখন কাফেলা ইরাকী গেইট অতিক্রম করে চলে গিয়েছিল। অবশ্য কাফেলার মশাল দেখা যাচ্ছিল। আসাদ ছেলেদ্বয়কে বললো, ঐ কাফেলা দেখা যাচ্ছে, তোমরা দৌঁড়ে গিয়ে ওদের সাথে মিলিত হও। অসহায় ছেলেদ্বয় কাফেলার দিকে দৌড় দিলেন কিন্তু কাফেলা অনেক দূরে চলে গিয়েছিল। ফলে ছেলেদ্বয় কাফেলার নাগাল পেল না, রাত্রির অন্ধকারে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিল। সারা রাত এদিক ওদিক ঘুরতে রইলো। ভোর হয়ে আসলে একটি ঝর্ণা তাদের নজরে পড়ে। তারা ক্লান্ত পরিশ্রান্ত হয়ে সেই ঝর্ণার পাড়ে গিয়ে বসে পড়লো। ঘটনাক্রমে এক বাঁদী সেই ঝর্ণা থেকে পানি নিতে এসে ছেলেদ্বয়কে দেখে ফেললো এবং যখন জানতে পারলো যে এরা ইমাম মুসলিমের অসহায় এয়াতীম ছেলেদ্বয়, তখন সে ওদের প্রতি বড় সহানুভূতিশীল হলো এবং বললো তোমরা আমার সাথে চলো। আমার গৃহকর্তী আহলে বায়তের ভক্ত। তোমাদেরকে পেয়ে দারুন খুশী হবেন । কোন ভয় কর না, আমার সাথে চলো। অনিদ্রা ও অনাহারে কাতর ছেলেদ্বয় ওর সাথে গেল। যখন ঘরে পৌঁছলো এবং গৃহকর্তী জানতে পারলো যে এরা মুসলিমের এয়াতিম সন্তান তখন দৌঁড়ে এসে ওদেরকে বুকে জড়িয়ে ধরে ওদের এ দুর্দশার জন্য কেঁদে দিল। অতঃপর ওদেরকে পানাহার করায়ে একটি কামরায় শোয়ায়ে দিল।

খোদার কী লীলা! মহিলাটা ছিল খোদাভীরু ও আহলে বায়তের প্রতি অনুরক্ত

কিন্তু হারেছ নামে ওর স্বামীটা ছিল খোদাদ্রোহী ও আহলে বায়তের দুশমন। ইবনে যিয়াদ থেকে পুরস্কারের লালসায় সে সারা দিন ছেলে দুটির সন্ধানে ছিল। কী অদ্ভুত ব্যাপার! যে ছেলেদ্বয়ের সন্ধানে সে সারা দিন ব্যস্ত ছিল সে ছেলেদ্বয় ওর ঘরে আরাম করছে। রাত্রে যখন এ জালিম ঘরে আসলো, ওর স্ত্রী তাড়াহুড়া করে খাবার দিল, যাতে সাহসা শুইয়ে পড়ে এবং ছেলেদ্বয়ের ব্যাপারে কোন কিছু টের না পায়। সারাদিনের ক্লান্তিতে বিছানায় শোয়া মাত্র সে ঘুমিয়ে পড়লো।

কিছু রাত অতিবাহিত হওয়ার পর বড় ভাই ছোট ভাইকে জাগায়ে বললো, ভাই, আমি এখন স্বপ্ন দেখলাম যে আমাদের আব্বাজান বেহেশতে হুযূর নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে ঘুরা-ফেরা করছেন এবং নবী করিম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে বলছেন, হে মুসলিম, তুমি নিজে চলে এলে কিন্তু ছেলেদ্বয়কে জালিমদের মধ্যে ছেড়ে আসলে? আব্বাজান আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! ওরাও আসতেছে সকাল হবার আগেই এসে পৌঁছবে।

ছোট ভাই বললো, ভাইজান, আমিও একই স্বপ্ন দেখেছি। তখন উভয়ে আত্মহারা হয়ে কেঁদে উঠলো। ওদের কান্নায় হারেছের ঘুম ভেঙ্গে গেল। স্ত্রীকে জিজ্ঞেস করলো, কান্নার আওয়াজ কোত্থেকে আসতেছে? ঘরে কী কেউ লুকায়ে আছে? স্ত্রী হতভম্ব হয়ে গেল এবং ঘাবড়িয়ে গেল আল্লাহই জানে এখন সে কি করে? হারেছ উঠলো এবং বাতি জ্বালিয়ে ভিতরের কামরায় গেল এবং ইয়াতীম ছেলেদ্বয়কে ক্রন্দনরত অবস্থায় দেখে জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে? ছেলেদ্বয় পরিস্কার বলে দিল। আমরা ইমাম মুসলিমের সন্তান। হারেছতো আশ্চর্য ও আনন্দে আত্মহারা। কারণ যাদের সন্ধানে সে ছিল সারা দিন ব্যস্ত, তারা দিব্যি আরামে তার ঘরে শায়িত। এ জালিম আর দেরী করেনি, ওদেরকে টেনে ঘর থেকে বের করলো। ওর স্ত্রী বেচারী ওর হাত পা ধরে আপ্রাণ চেষ্টা করলো ছেলেদ্বয়কে রক্ষা করতে কিন্তু জালিম কোন কথা শুনলো না। সে ওদেরকে হত্যা করার উদ্দেশ্যে ফোরাত নদীর দিকে নিয়ে গেল। ছেলেদ্বয় যখন বুঝতে পারলো যে এ জালিম ওদেরকে হত্যা করবে, তখন তারা বললো, আমরা প্রবাসী এয়াতীম, আমরা কি আপরাধ করেছি আমাদেরকে হত্যা করছ? এ জালিম কোন কথা শুনলো না। একে একে উভয়কে শহীদ করে দিল। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন)
(তাজকিরা- ৪৮ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের জানমালের উপর বড় বড় পরীক্ষা হয়েছে। তাঁরা কোন সময় সবর ও শোকরের দামান হাতছাড়া করেন নি। আল্লাহর ইচ্ছায় তাঁরা সব সময় সন্তুষ্ট ছিলেন। কোন আপত্তি বা অভিযোগ উত্থাপন করেন নি।

কাহিনী নং ৩১৫

জালিমের পরিণতি

জালিম হারিছ হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ছেলেদ্বয়কে শহীদ করে পুরস্কারের আশায় মস্তক দু'টি নিয়ে ইবনে যিয়াদের কাছে গেল। ইবনে যিয়াদ সেই ছোট্ট নূরানী মস্তক দু'টি দেখে জিজ্ঞেস করলো, এগুলো কার? হারিছ বললো মুসলিমের ছেলেদ্বয়ের। ইবনে যিয়াদ আনন্দিত হওয়ার পরিবর্তে রাগান্বিত হয়ে ওকে বললো, নাফরমান, আমিতো ইয়াযিদকে চিঠি লিখে খবর দিয়েছি যে ছেলেদ্বয় আমার কাছে বন্দী আছে। সে যদি এদেরকে জীবিত তলব করে, তাহলে আমি কি করবো? তুমি ওদেরকে আমার কাছে কেন জীবিত আননি। হারিছ বললো, জীবিত আনতে গেলে শহরবাসীরা আমার থেকে ছিনিয়ে নিত এবং আমিও পুরস্কার থেকে বঞ্চিত হতাম। ইবনে যিয়াদ বললো, তুমিতো আমাকে গোপনীয়ভাবে খবর দিতে পারতে। হারিছ নিশ্চুপ হয়ে গেল। ইবনে যিয়াদ তার অন্যতম জাল্লাদ মকাতেলকে নির্দেশ দিল, যেন ফোরাত নদীর তীরে নিয়ে ওকে হত্যা করে এবং যেখানে ছেলেদ্বয়ের লাশ ফেলেছে সেখানে মস্তকদ্বয়ও যেন ফেলে দেয়া হয়। মাকাতেল আহলে বায়তের ভক্ত ছিল। সে এ হুকুম পেয়ে দারুন খুশী হলো। সে হারিছকে বাইরে নিয়ে এসে হাত দুটি পিছমোড়া বাঁধলো এবং মাথা মুণ্ডায়ে দিল। মাকাতেল সমমনাদেরকে বললো, এ দায়িত্বটা পেয়ে আমি এতটুকু খুশী হয়েছি যে ইবনে যিয়াদ আমাকে সারা সাম্রাজ্য দিয়া দিলেও আমি ততটুকু খুশী হতাম না। মস্তকদ্বয় ও হারিছকে নিয়ে মাকাতেল যখন বাজারের পথ দিয়ে যাচ্ছিল তখন লোকেরা মস্তকদ্বয় দেখে কান্নায় ভেঙ্গে পড়ে এবং হারিছকে লানত দিচ্ছিল। ফোরাত নদীর তীরে নিয়ে গিয়ে প্রথমে মস্তকদ্বয় নদীতে ছেড়ে দিল, খোদার কুদরতে উভয়ের শরীর এসে মস্তকের সাথে মিলিত হয়ে পানিতে ডুবে গেল।

অতঃপর হারিছকে হত্যা করে লাশ ফোরাত নদীতে নিক্ষেপ করলো। কিন্তু ফোরাত নদী সেই লাশ গ্রহণ করলো না পাড়ে নিক্ষেপ করলো। নিরুপায় হয়ে

নদীর পাড়ে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিল। কিন্তু মাটিও গ্রহণ করলো না, বের করে দিল। শেষ পর্যন্ত ওকে লাকড়ীর স্তুপের মধ্যে রেখে পুড়ে ফেললো। (তাজকিরা ৫০ পৃঃ)

সবকঃ দ্বীন থেকে মুখ ফিরায়ে দুনিয়ার প্রতি আকৃষ্ট হলে পরিণতি এ রকমই হয়ে থাকে। এমন লোকের দুনিয়ার কোন জায়গায় ঠাঁই নেই।

কাহিনী নং ৩১৬

কূফা যাত্রা

হযরত ইমাম মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু)কে যেদিন শহীদ করা হয়েছিল, সেই দিন হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কূফার উদ্দেশ্যে মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে রওয়ান হন। পরিবার পরিজন, সহচর ও খাদেম সহ সর্বমোট বিরাশি জন তাঁর সাথে ছিলেন, এ ছোট্ট কাফেলা যখন মক্কা মুয়াজ্জমা থেকে রওয়ানা হচ্ছিলেন। তখন মক্কার ছোট বড় সবাই তাঁদেরকে বিদায় দিতে গিয়ে অশ্রু সিক্ত ও ভারাক্রান্ত হয়ে পড়েছিল। ইমাম হোসাইনের এ কাফেলা যখন শকুক নামক স্থানে পৌছে যাত্রা বিরতি করছিল, তখন কূফা থেকে আগমনকারী এক ব্যক্তি থেকে জানা গেল যে কূফাবাসীরা বেওফায়ী করেছে এবং ইমাম মুসলিমকে শহীদ করে ফেলেছে। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এ খবর শুনে 'ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজেউন' পড়লেন এবং তাঁবুর অভ্যন্তরে গিয়ে ইমাম মুসলিমের মেয়ের মাথার উপর হাত বুলায়ে আদর করলেন এবং শান্তনাদায়ক ও সহানুভূতিমূলক কথা বললেন। হযরত ইমাম মুসলিমের কন্যা হঠাৎ এ আচরণ দেখে আরয করলেন, আজ আপনি আমার সাথে এয়াতিম কন্যাকে শান্তনা দেয়ার মত কথা বলছেন কেন? মনে হয় আমার আব্বাজান মারা গেছেন। এ কথা শুনে ইমাম হোসাইন অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁদে দিলেন এবং বললেন, মা তুমি ধৈর্যধারণ কর। মনে কর, আমি তোমার বাপ, আমার বোন তোমার মা, আমার ছেলে মেয়ে তোমার ভাই বোন। এত কিছু শান্তনার বাণী শুনার পরও পিতৃহারা কন্যা কান্না থামাতে পারলো না। ইমাম মুসলিমের অন্যান্য সন্তানেরাও পিতার শাহাদতের কথা শুনে কেঁদে উঠলেন। পরে ধৈর্যধারণ করে একান্ত বাহাদুরীর সাথে বললেন, চাচাজান, ইনশা আল্লাহ আমরা কূফাবাসীদের থেকে রক্তের বদলা নেব নতুবা নিজেরাই ওনার মত শহীদ হয়ে যাব। ইমাম

হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তাদের এ মনোভাব দেখে সহযাত্রী সবাইকে লক্ষ্য করে সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রাখলেন। তিনি বললেন, কূফাবাসী বেঈমানী করেছে এবং মুসলিম (রাদি আল্লাহু আনহু)কে শহীদ করেছে। তোমাদের মধ্যে যার ইচ্ছে ফিরে যাও। এ কথা শুনে যারা এদিক সেদিক থেকে এসে কাফেলায় মিলিত হয়েছিল, তারা চলে গেল এবং যারা শহীদ হওয়ার জন্য লালায়িত ছিল, একমাত্র তারাই রয়ে গেল এবং সামনের দিকে এগিয়ে চললো। সায়ালাবা নামক স্থানে কিছুক্ষণের জন্য যাত্রা বিরতি করলেন। ইমাম হোসাইন সওয়ারী থেকে অবতরণ করে স্বীয় বোন যয়নাব (রাদি আল্লাহু আনহা) এর যানুর উপর মাথা রেখে শুয়ে পড়লেন। কিছুক্ষণ পর ক্রন্দনরত অবস্থায় জেগে উঠলেন এবং বললেন, বোন, আমি এ মাত্র নানাজান (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্ন দেখেছি। তিনি (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কেঁদে কেঁদে বললেন, হে হোসাইন, তুমি শীঘ্র আমার সাথে মিলিত হবে। এক অশ্বারোহী বলছিল, মানুষ চলছে, ওদের নিয়তি ওদেরকে যথাস্থানে নিয়ে যাচ্ছে। হযরত আলী আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আব্বাজান! আমরা কি হকের উপর নই? ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, নিশ্চয়ই আমরা হকের উপর আছি এবং হক আমাদের সাথে আছে। এ উত্তর পাওয়ার পর আলী আকবর আরয করলেন, তাহলে মৃত্যুর ভয় কেন? মৃত্যুতো একদিন হবে। আব্বাজান, আমি শাহাদতের বাগানকে ফলে ফুলে ভরপুর দেখছি। দুনিয়া থেকে উত্তম স্থান ও নেয়ামতসমূহ আমাদের সামনে রয়েছে।
(তাজকিরাত ৫৭ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ও তাঁর পরিবারের সবাই সত্যের ঝান্ডাকে উত্তোলিত রাখার জন্য দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ ছিলেন। মৃত্যুর ভয়ে ওনারা আদৌ শংকিত ছিলেন না। ইয়াযিদের শরীয়ত বিরোধী কাজ কর্মের প্রতিবাদ করতে গিয়ে দুনিয়াবী ক্ষতির দিকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করেন নি।

কাহিনী নং ৩১৭

হুর বিন রুবাহী

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আগমনের খবর পেয়ে ইবনে যিয়াদ হুর বিন রুবাহীকে এক হাজার সৈন্য সমেত শহরের বাইরে পাঠিয়ে দিল যেন আসার পথে ইমাম হোসাইনকে গ্রেপ্তার করে কূফায় নিয়ে আসে। ইমাম

হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) দূর থেকে এ বাহিনীকে দেখতে পেয়ে খোঁজ খবর নেয়ার জন্য একজন লোক পাঠালেন। এরই মধ্যে হুর বিন রুবাহী স্বয়ং ইমাম হোসাইনের সামনে এসে পৌঁছলো এবং বললো, আমাকে ইবনে যিয়াদ পাঠিয়েছে আপনাকে নজরবন্দী করে কূফায় নিয়ে যাবার জন্য। ইমাম হোসাইন এ কথা শুনে সেই বাহিনীকে লক্ষ্য করে বললেন, এদিকে আসার আমার ইচ্ছা ছিল না কিন্তু তোমাদের অগণিত চিঠি ও বার্তা বাহকের একান্ত আগ্রহে আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। এখন যদি তোমরা তোমাদের প্রতিশ্রুতিতে অটল থাক, তাহলে তোমাদের শহরে যাব, অন্যথায় ফিরে যাব। হুর বললো, খোদার কসম, আমি এ সব কিছু জানি না। ইমাম হোসাইন বললেন, তোমার এ বাহিনীতে এমন অনেক লোক মওজুদ আছে, যারা আমাকে চিঠি লিখেছে। অতঃপর তিনি চিঠিগুলো পড়ে শুনালেন। অধিকাংশ মাথা নিচু করলো এবং কোন প্রতি উত্তর করলো না। হুর ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বললো, ইবনে যিয়াদ আপনাকে গ্রেপ্তার করে কূফায় নিয়ে যাবার জন্য আমাকে নির্দেশ দিয়েছে। কিন্তু আমি আপনার সাথে সেই বেআদবী করতে মোটেই ইচ্ছুক নই। তবে আমার সাথে যেহেতু ওর অনুচর রয়েছে সেহেতু আমার মতে এটাই সঙ্গত হবে যে আমি সারাদিন আপনার সাথে থাকবো। রাত্রে পরিবার পরিজনের সাথে রাত্রি যাপনের কথা বলে আমার থেকে আলাদা হয়ে যাবেন এবং আমার বাহিনী শুয়ে পড়লে আপনি যেদিকে ইচ্ছে সে দিকে চলে যাবেন। সকালে জংগলে কিছুক্ষণ তালাশ করে ফিরে যাব এবং ইবনে যিয়াদকে কোন একটা উত্তর দিব।

(সিররুশ শাহাদাতাইন ১৯ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কেবল দলীল স্থাপন করার জন্য ওসব লোকের আহবানে তথায় গিয়েছিলেন এবং একমাত্র দ্বীনি জজবা তাঁকে এগিয়ে নিয়ে গিয়েছিল। আহলে বায়ত বিদ্বেষীরা বলে থাকে যে তিনি রাজত্বের লালসায় তথায় গিয়েছিলেন। তাদের কথা মত যদি এ উদ্দেশ্য হতো, তাহলে তিনি কক্ষনো এভাবে অপ্রস্তুত অবস্থায় যেতেন না। তিনি নিশ্চয় জানতেন যে, শত্রুপক্ষ খুবই শক্তিশালী এবং বিরাট সৈন্য বাহিনীর অধিকারী। এহেন অবস্থায় পরিবার পরিজন ও মাত্র কয়েকজন সফর সঙ্গী নিয়ে তিনি রওয়ানা হতেন না। কোন বেওকুফও বলবে না যে তিনি রাজত্ব দখল করার জন্য বের হয়েছিলেন।

কাহিনী নং ৩১৮

কারবালা ময়দান

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কূফা রওয়ানা হওয়ার খবর পেয়ে ইবনে যিয়াদ হুর বিন রুবাহীর নেতৃত্বে এক দল সৈন্য কূফা সীমান্তে পাঠিয়ে ছিল। হুর ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে মিলিত হয়ে পরামর্শ দিল যে পরিবার পরিজনের বাহানা করে আলাদা অবস্থান করবেন এবং সৈন্যরা শুইয়ে পড়লে রাত্রেই অন্যত্র চলে যাবেন। ইমাম হোসাইন তাই করলেন। রাত্রে ইয়াযিদী বাহিনী শুইয়ে পড়লে তিনি তাঁর সফর সঙ্গীদের নিয়ে ওখান থেকে যাত্রা দিলেন। অন্ধকার রাত্রে কোন্ দিক থেকে কোন্ দিকে যাচ্ছিলেন কিছু বুঝে উঠতে পারছিলেন না। ভোরে এক ভয়াল ময়দানে এসে উপনিত হলেন। তথায় অবতরণ করে যেখানেই তাঁবুর খুঁটি পুততে চাইলো, জমীন থেকে রক্ত বের হচ্ছিল। গাছের ডাল ভাঙ্গতে চাইলে ওখান থেকেও রক্ত বের হচ্ছিল। এ অবস্থা দেখে ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) সফর সঙ্গীদেরকে জিজ্ঞেস করলেন এ ভয়াল ময়াদানের নাম তোমাদের কারো কি জানা আছে? একজন বললেন একে মারিয়া ময়দান বলা হয়। তিনি বললেন, সম্ভবতঃ অন্য নামও থাকতে পারে। অন্যরা বললেন, একে কারবালাও বলা হয়। এ কথা শুনে তিনি 'আল্লাহু আকবর' বলে ঘোষণা করলেন اَرْضِ كَرْبٍ وَبَلَاءٍ وَسَفْكِ دِمَاءٍ অর্থাৎ এটাই কারবালা ময়দান। এটাই আমাদের রক্ত প্রবাহিত হওয়ার স্থান। এখান থেকে আমরা অন্য কোথাও যেতে পারবো না। এখানেই দুশমনেরা আমাদের রক্ত প্রবাহিত করবে। এখান থেকে আমরা কখনো জীবিত যেতে পারবো না। এ জায়গায় হবে নবী বংশের করুণ পরিণতি। সবাই এখানে বীর বিক্রমে জান উৎসর্গ করবে। এ জায়গার নাম হচ্ছে কারবালা (দুঃখ ও দুর্দশার স্থান) শিশুরাও এখানে এক ফোঁটা পানি পাবে না। মুস্তাফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাগানের ফুলরাজি এখানে ঝরে পড়বে। আমাদের মৃতদেহ এখানেই পড়ে থাকবে।

হযরত আলী আকবর তাঁর পিতার মুখে এ সব কথা শুনে বললেন, আব্বাজান আপনি এসব কি বলছেন, তিনি বললেন, বেটা তোমার দাদাজান এ পথ দিয়ে যাবার সময় এখানে দাড়িয়ে ছিলেন এবং বড় ভাই হযরত হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জানুর উপর মাথা রেখে শুইয়ে ছিলেন। আমি শিয়রের পাশে দাঁড়িয়ে ছিলাম। তিনি ক্রন্দনরত অবস্থায় জেগে উঠলেন। বড় ভাই কান্নার কারণ জিজ্ঞেস করলে বলেন, আমি এ মাত্র স্বপ্নে এ জায়গায় রক্তের সাগরে হোসাইনকে হাবুডুবু খেতে দেখলাম। সে ফরিয়াদ করছে কিন্তু কেউ তার ফরিয়াদ শুনছেনা। অতঃপর আমাকে লক্ষ্য করে বললেন, বেটা! যখন এ জায়গায় সেই ভয়াল অবস্থা তোমার সম্মুখীন হবে, তখন তুমি কি করবে? আমি বলেছিলাম, ধৈর্যধারণ করবো। তিনি সন্তুষ্ট হয়ে বলেছিলেন, তাই করিও, ধৈর্যধারণকারীদের ছওয়াব অগণিত।

اِنَّمَا يُوَفَّى الصَّابِرُوْنَ اَجْرَهُمْ بِغَيْرِ حِسَابٍ

এ বলে সবাইকে সওয়ারী থেকে মালপত্র নামাতে বললেন এবং ফোরাত নদীর কিনারে তাঁবু স্থাপন করলেন। ৬১ হিজরীর ২রা মুহররমই তিনি কারবালা ময়দানে অবস্থান নিয়েছিলেন।

(তাজকিরা ৬১ পৃঃ)

সবকঃ কারবালা ময়দান আগ থেকেই হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পরীক্ষার স্থান হিসেবে নির্ধারিত ছিল এবং হযরত হোসাইনেরও তাঁর এ পরীক্ষার কথা জানা ছিল। এটা তাঁরই শান ও বৈশিষ্ট্য যে এ পরীক্ষার জন্য তিনি সব দিক থেকে তৈরী ছিলেন। তিনি তাঁর দৃঢ়তা ও মনোবলের মধ্যে সামান্যতম পরিবর্তন আসারও সুযোগ দেন নি।

কাহিনী নং ৩১৯

ধৈর্যের প্রশিক্ষণ

ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে অবস্থান নেয়ার পর আহলে বায়তের সবাইকে একত্রিত করে বললেনঃ

আমার মসীবতে ও বিচ্ছেদে ধৈর্যধারণ করিও। যখন আমি মারা যাব, তখন শোকে মুখে আঘাত করিও না, চুল ছিড়িও না, গায়ের কাপড় নষ্ট করিও না। ওহে আমার বোন যয়নাব, তুমি ফাতেমা যোহরার কন্যা। উনি যেমন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বিরহে ধৈর্যধারণ করেছিলেন, তুমিও সে রকম ধৈর্যধারণ করিও।

(আনারাতুল বছায়ের ২৯৭ পৃঃ)

সবকঃ এ ব্যাপারে সবাই একমত যে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজেও ধৈর্যধারণ করেছেন এবং তাঁর সাথে সংশ্লিষ্ট সবাইকেও ধৈর্যধারণ করার জন্য উপদেশ দিয়েছেন। অতএব আমাদেরও ধৈর্যধারণ করা উচিৎ এবং মাতম করা থেকে বিরত থাকা বাঞ্চনীয় যেন ইমাম হোসাইনের সন্তুষ্টি লাভ করা যায়।

কাহিনী নং ৩২০

ইবনে যিয়াদের চিঠি

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন কারাবালা ময়দানে অবস্থান নিলেন। তখন ইবনে যিয়াদ ইমাম হোসাইনের কাছে একটি চিঠি পাঠালো। চিঠির বিষয়বস্তু হলো- ইয়াযিদের বায়াত করুন অথবা যুদ্ধের জন্য তৈরী হয়ে যান। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এ চিঠি পড়ে ছিঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বাহককে বললেন مَالَهُ جَوَابٌ عِنْدِيْ অর্থাৎ আমার কাছে এর কোন উত্তর নেই। ইবনে যিয়াদ এটা শুনে খুবই রাগান্বিত হলো এবং ইবনে সাদকে ডেকে বললো, তুমি অনেক দিন থেকে রায় রাজ্যের শাসক হতে আগ্রহী। আজ তোমার জন্য একটি বড় সুযোগ এসেছে। তুমি হোসাইনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে যাও এবং হোসাইনকে ইয়াযিদের বায়াত করতে বাধ্য কর অথবা মাথা কেটে নিয়ে এসো। এ কাজটি করতে পারলে তোমাকে রায় রাজ্যের শাসনভার দেয়া হবে। দুনিয়ার কুকুর ইবনে সাদ রায় রাজ্যের রাজত্বের লালসায় ইমাম হোসাইনের বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে তৈরী হয়ে গেল এবং সৈন্যবাহিনী নিয়ে কারবালায় পৌঁছে গেল। কারাবালা গিয়ে ইমাম হোসাইনের সাথে দেখা করে জান্তে চাইলো, আপনি এখানে কি উদ্দেশ্যে এসেছেন? তিনি বললেন, কূফাবাসীরা আমাকে এখান আসার জন্য অগণিত চিঠি দিয়েছে। তাই আমি আসতে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু তোমাদের বিশ্বাসঘাতকতার কথা জানার পর এখন আমি এখান থেকে ফিরে যেতে চাই। আমি কোন সংঘাতে যেতে চাই না। ইবনে সাদ ইমাম হোসাইনের একথা ইবনে যিয়াদকে জানালে সে সাদের উপর ক্ষেপে যায় এবং নির্দেশ পাঠালো যে তোমাকে আমি মুকাবিলা করার জন্য পাঠিয়েছি, সন্ধি করার জন্য পাঠাইনি। আমি হোসাইন থেকে ইয়াযিদের বরাত ভিন্ন অন্য কোন প্রস্তাব গ্রহণ

করতে রাজি নই। এর পর ইবনে যিয়াদ, শিমার, শিত ও অন্যান্য জালিমদের নেতৃত্বে আরও হাজার হাজার সৈন্য প্রেরণ করলো এবং নির্দেশ দিল যে হোসাইনের জন্য ফোরাত নদীর পানিও যেন বন্ধ করে দেয়া হয় এবং সব দিক থেকে যেন কোণঠাসা করা হয়।
(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৫৬ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) দ্বীনের খাতিরে কারবালা ময়দানে তশরীফ এনেছিলেন এবং ইবনে সাদ, সীমার প্রমুখ দুনিয়াবী হুকুমতের লালসায় মুকাবিলা করতে এসেছিল। ইমাম হোসাইন সংঘাত থেকে বিরত থাকার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেন কিন্তু কিছুতেই সম্ভব হলো না। ওরাই সমস্ত ফিতনা সৃষ্টি করেছিল।

কাহিনী নং ৩২১

ফোরাত নদী

ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে ফোরাত নদীর সন্নিকটে তাঁবু স্থাপন করেছিলেন। কিন্তু মুহররম মাসের সাত তারিখ ইবনে সাদ বিরাশী হাজার সৈন্য নিয়ে ফোরাত নদী ঘিরে ফেলে এবং ইমাম হোসাইনকে নদীর পানি নিতে বাঁধা দেয়। সেই সৈন্য বাহিনীতে প্রায় ঐ সব লোক ছিল, যারা হযরত আলী ও হোসাইনের ভক্ত বলে দাবী করতো এবং যারা চিঠি দিয়ে হযরত ইমাম হোসাইনকে কূফা আসার জন্য আকুল আবেদন জানিয়েছিল। এখন তারা নিজেরাই ওনার পানি বন্ধ করে দিল। ইবনে সাদ হযরত হোসাইনকে বললো, তাঁর তাঁবুটা যেন নদীর কিনারা থেকে সরায়ে নেয়। হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রতিবাদ করে বল্লেন, তা কিছুতেই হতে পারে না। কিন্তু ইমাম হোসাইন হযরত আব্বাসকে বাঁধা দিয়ে বললেন, এ সামান্য বিষয়ে ঝগড়া করে কোন লাভ নেই। অতঃপর তাঁবুটা ওখান থেকে সরায়ে নিলেন। (তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৯৬ পৃঃ)

সবকঃ সাকীয়ে কাউসার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দৌহিত্র ও তাঁর পরিবার পরিজনের পানি বন্ধ করে দেয়াটা ছিল ইয়াজিদ বাহিনীর সীমাহীন নিষ্ঠুরতা এবং তাঁবু অপসারণ করাটা ছিল ইমাম হোসাইনের সীমাহীন উদারতার বহিঃপ্রকাশ।

কাহিনী নং ৩২২

কূপ

মুহররমের সাত তারিখ জালিমরা ফোরাত নদীর পানি বন্ধ করে দিয়েছিল। আট তারিখ আহলে বায়তের ছোট্ বড় সবাই তৃষ্ণায় কাতর হয়ে পানি পানি করে হাহুতাশ করছিল। তখন ইমাম হোসাইন ওখানে একটি কূপ খনন করায়েছিলেন। সেখান থেকে কয়েকজন পানিও পান করেছিল কিন্তু খোদার কি মর্জি সেই কূপ অদৃশ্য হয়ে যায়।
(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৫৭ পৃঃ)

সবকঃ স্বয়ং আল্লাহ তাআলার এটা অভিপ্রায় ছিল যে ইমাম হোসাইনের বাহিনী শোকর ও ধৈর্যের পরাকাষ্ঠা দেখায়ে হাউজে কাউসারের পানি দ্বারা স্বীয় তৃষ্ণা নিবারণ করবেন।

কাহিনী ৩২৩

বরীর হামদানী ও ইবনে সাদ

মুহররমের ৯ তারিখ ইমাম হোসাইনের অন্যতম সফর সঙ্গী হযরত বরীর হামদানী (রাদি আল্লাহু আনহু) ইমাম হোসাইনের অনুমতি নিয়ে ইবনে সাদের কাছে গেলেন এবং কোন সালাম কালাম ছাড়া ওর সামনে বসে পড়লেন। ইবনে সাদ বললো, হামদানী, তুমি কি আমাকে মুসলমান মনে করনা, যার জন্য আমাকে সালাম করলে না? হামদানী বললেন, এ ধরনের মুসলমান দাবী করার জন্য আমি ধিক্কার জানাই। তুমি কেমন মুসলমান? একদিকে ইসলামের দাবী করতেছ অন্যদিকে আহলে বায়তকে নদী থেকে পানি নিতে দিচ্ছ না। যে ফোরাত নদী থেকে পশু পাখীরা পর্যন্ত পানি পান করতে পারছে কিন্তু সাকীয়ে কাউসার (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কালিজার টুকরাকে পানি পান করতে দিচ্ছ না। ইবনে সাদ বললো, কথা সত্য কিন্তু কি করবো, আমারতো রায় রাজ্যের শাসন ভার চাই। (তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৫৮ পৃঃ)

সবকঃ দুনিয়া পূজারী স্বীয় পরিণতির খবর রাখে না।

কাহিনী নং ৩২৪

মজলুম সৈয়দ

মুহররমের ৯তারিখ সকাল থেকে দ্বিপ্রহর পর্যন্ত ইবনে সাদের সাথে আলোচনায় অতিবাহিত হলো। যোহরের নামাযের পর হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁবুর বাইরে বসে কালামে পাক তেলাওয়াত করছিলেন এবং চক্ষুদ্বয় থেকে অশ্রুধারা প্রবাহিত হচ্ছিল। সেই সময় এক মুসাফির সেই পথ দিয়ে যাবার সময় হযরত ইমাম হোসাইনের এ অবস্থা দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি বলেন, আমি নবী বংশের আওলাদ, মুসাফির হয়ে এখানে এসে ভীষণ দুঃখ দুর্দশায় পতিত হয়েছি। কূফাবাসীরা অগণিত চিঠি লিখে ও বার্তা বাহক প্রেরণ করে আমাকে এখানে ডেকে এনে আমার সাথে বেওফায়ী করেছে এবং আমার রক্ত পিপাসু হয়ে গেছে।
(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৫৮)

সবকঃ ইমাম হোসাইনের এ ঘটনা অর্থাৎ কূফাবাসীরা আহলে বায়তের প্রতি মহব্বতের মিথ্যা অভিনয় করে যে জুলুম অত্যাচার করেছে, তা কিয়ামত পর্যন্ত ঘোষিত হবে। এ ধরনের ভণ্ডদের থেকে সদা দূরে থাকা উচিত।

কাহিনী নং ৩২৫

সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আগমন

মুহররমের ৯ তারিখ দিবাগত রাত হযরত ইমাম হোসাইন আল্লাহর ইবাদত বন্দেগীতে অতিবাহিত করলেন। শেষ রাত্রে আল্লাহর ধ্যানে এমন বিভোর হয়ে পড়ে ছিলেন যে পার্থিব কোন কিছুর প্রতি আদৌ খেয়াল ছিল না। এহেন অবস্থায় হুযুর সৈয়্যদুল আম্বিয়া (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফিরিস্তাগণের এক বাহিনী নিয়ে কারবালা ময়দানে আগমন করেন এবং ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কে শিশুর মত কোলে নিয়ে আদর করলেন এবং বললেন, আমার প্রিয় বৎস, আমি ভালভাবে অবগত যে দুশমন তোমার পাশে দাঁড়ানো আছে এবং তোমাকে হত্যা করতে চাচ্ছে। প্রিয় বৎস, তুমি একান্ত সবর ও শুকরীয়ার সাথে এ সময়টা অতিবাহিত কর। তোমার হত্যাকারীরা কিয়ামতের দিন আমার শাফায়াত থেকে বঞ্চিত থাকবে এবং তুমি শাহাদাতের অনেক উচ্চ স্থান লাভ করবে। অল্প কিছুক্ষণ

পরই তুমি এ কারবালা ময়দান ত্যাগ করবে। তোমার জন্য জান্নাতকে সজ্জিত করা হয়েছে। তোমার আব্বা-আম্মা বেহেশতের দরজায় তোমার অপেক্ষায় তোমার পথপানে তাকিয়ে আছে। এ কথাগুলো বলে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হযরত হোসাইনের মাথা ও বুকে হাত মুবারক বুলায়ে দুআ করলেন اَللّٰهُمَّ اَعْطِ الْحُسَيْنَ صَبْرًا وَّاَجْرًا হে আল্লাহ,আমার হোসাইনকে সবর ও পূণ্য দান কর।

সকালে আহলে বাইতের সবাইকে এ ঘটনা বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করলেন, তখন সবাই একে অপরের দিকে কৌতূহল দৃষ্টিতে তাকাতে লাগলেন।

(তফতীহুশ শাহাদাতাইন)

সবকঃ কারবালার সমস্ত ঘটনাবলী হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চোখের সামনে ছিল। তিনি জালিমদের জুলুম এবং সবরকারীদের সবর অবলোকন করছিলেন।

কাহিনী নং ৩২৬

কারামাত

মুহররমের ১০ তারিখ ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁবুর চারিদিকে যে পরিখা খনন করায়েছিলেন, সেটা লাকড়ী দ্বারা ভরপুর করে আগুন লাগিয়ে দিলেন, যেন ক্ষতিকর প্রাণী ইত্যাদি থেকে নিরাপদ থাকা যায় এবং দুশমন তাবুর কাছে পৌছতে না পারে। এক ইয়াযিদী চেলা এ আগুন দেখে বললো, হে হোসাইন দোযখের আগুনের আগেই তুমি নিজেকে আগুনে নিক্ষেপ করলে (মাযাল্লা)। হযরত ইমাম হোসাইন প্রত্যুত্তরে বললেন, كَذَبْتَ يَاعَدُوَّ اللّٰهِ হে আল্লাহর দুশমন, তুমি মিথ্যা বলেছ। এটা তোমাদের জন্যই জ্বালানো হয়েছে। অতঃপর তিনি কেবলামুখি হয়ে বললেন اَللّٰهُمَّ اَجِرْهُ اِلَى النَّارِ হে আল্লাহ! ওকে আগুনের দিকে টেনে আন। এ দুআ করা মাত্র সেই বেআদবের ঘোড়ার পা একটি গর্তে পতিত হয় এবং ঘোড়া পড়ে যায়। এতে সেই বেআদবের হাত লাগাম থেকে ছুটে যায় এবং পিছলে গিয়ে লাগামের সাথে আটকে যায়। এ অবস্থায় ঘোড়া গর্ত থেকে উঠে দৌড় দেয় এবং পরিখার কাছ দিয়ে যাবার সময় সে আগুনে ছিটকে পড়ে এবং ঘোড়া একে ফেলে চলে যায়। এ দৃশ্য দেখে ইমাম হোসাইন

শোকরানা সিজদা আদায় করেন এবং মাথা উঠায়ে উচ্চস্বরে বললেন, হে আল্লাহ, আমি তোমার রসূলের আউলাদ। তুমি জালিমদের বিচার কর। ইতোমধ্যে আর এক জালিম এসে ইমাম হোসাইনকে লক্ষ্য করে বললো, হে হোসাইন, দেখ, ফোরাত নদীর পানি কি সুন্দরভাবে ঢেউ খেলছে কিন্তু তোমার ভাগ্যে ওখান থেকে এক ফোঁটা পানিও জুটছে না। এভাবে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় তোমাকে হত্যা করা হবে। এটা শুনে ইমাম হোসাইন খুবই মর্মাহত হয়ে অশ্রু সজল নয়নে আল্লাহর কাছে দুআ করলেন- হে আল্লাহ! তুমি একে তৃষ্ণায় মুত্যু দাও। দুআ করার সাথে সাথে ঘোড়া লাফালাফি করে ওকে পৃষ্ঠ থেকে ফেলে দিল। সে উঠে ঘোড়াকে ধরতে ঘোড়ার পিছে পিছে দৌঁড়তে লাগলো এবং ভীষণ তৃষ্ণার্ত হয়ে পড়লো। শেষ পর্যন্ত পানি পানি করে তৃষ্ণার্ত অবস্থায় মৃত্যু বরণ করলো।

(তাজকিরা ৬৮ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) আল্লাহর মাহবুব ছিলেন। আল্লাহ তাঁর প্রার্থনা কবুল করতেন। কিন্তু তাঁর শাহাদতের ব্যাপারটা যেহেতু অবধারিত ছিল এবং আল্লাহ ও রসূলের এটাও মর্জি ছিল সেহেতু এতে তিনি রাজি ছিলেন এবং একান্ত ধৈর্যসহকারে শাহাদত বরণ করেন।

কাহিনী নং ৩২৭

প্রমাণ স্থাপন

ইয়াযিদী বাহিনী যখন যে কোন অবস্থায় ইমাম হোসাইনের সাথে মুকাবিলা করতে দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ, তখন ইমাম হোসাইন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পাগড়ী মুবারক মাথায় বাঁধলেন এবং হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর তলোয়ার জুলফিকার হাতে নিয়ে উষ্টে আরোহন করে ইয়াযিদী বাহিনীর দিকে এগিয়ে গিয়ে ওদেরকে সম্বোধন করে বললেন-

হে ইরাকবাসী, তোমরা ভাল করে জান যে আমি রসূলের দৌহিত্র, হযরত আলী মরতুজার সন্তান এবং ইমাম হাসানের ভাই। আমার দিকে লক্ষ্য করে দেখ, আমার মাথায় কার পাগড়ী? খৃষ্টানরা এখনও মূসা আলাইহিস সালামের পায়ের নিশানাকে চুমু দেয়। প্রত্যেক জাতি-ধর্মের লোকেরা তাদের ধর্মীয় গুরুদের নিদর্শনের প্রতি শ্রদ্ধাশীল। আমি তোমাদের রসূলের দৌহিত্র, শেরে খোদা হযরত

আলীর সন্তান। তোমরা আমার সাথে কোন ভাল আচরণ না করলেও অন্ততঃ আমাকে হত্যা করনা। বল, তোমরা কি কারণে আমাকে ও আমার পরিবার পরিজনকে পানি থেকে বঞ্চিত রেখেছ? আমি কি তোমাদের কাউকে খুন করেছি বা কারো জমি দখল করেছি, যার বদলা নিচ্ছ? তোমরা নিজেরাই আমাকে এখানে ডেকে এনেছ আর এখন যা করছ তা কি মেহমানদারীর নমুনা? একটু ভেবে দেখ, তোমরা কি করছ?

তিনি এভাবে ভাষণ দিচ্ছিলেন। এদিকে তাঁবুর অভ্যন্তর থেকে তাঁর কানে কান্নার আওয়াজ ভেসে আসলে, তিনি কাতর হয়ে 'লা হাওলা' পড়লেন এবং হযরত আব্বাস ও আলী আকবরকে বললেন, তোমরা গিয়ে ওদেরকে কান্না থেকে বারণ কর এবং বল যেন একটু ধৈর্যধারণ করে, একটু পরে অনেক কাঁদতে হবে। উভয়ে গিয়ে ওদেরকে কান্না থেকে বিরত রাখলেন, তিনি পুনরায় ভাষণ দিতে শুরু করলেনঃ

হে কূফাবাসী, তোমরা নিশ্চয় আমার বংশ মর্যাদা সম্পর্কে অবগত। বর্তমান বিশ্বে যার কোন তুলনা নেই। চিন্তা করে দেখ, তোমরা নিজেরাই আমাকে চিঠির পর চিঠি দিয়ে ডেকে এনেছ। কিন্তু এখন তোমরা কেন আমার রক্তের পিপাসু হয়ে গেছ? এ দেখ, এগুলো হচ্ছে তোমাদের চিঠি।

ইমাম হোসাইন যখন ওদেরকে চিঠি দেখালেন তখন তারা অস্বীকার করলো এবং বললো, এগুলো আমাদের চিঠি নয়। ইমাম হোসাইন ওদেরকে এভাবে ডাহা মিথ্যা বলতে দেখে বিস্মিত হয়ে বললেন, আলহামদুলিল্লাহ! প্রমাণ স্থাপিত হলো। আমাকে দায়ী করার আর কোন সুযোগ রইলো না। (তাজকিরা ৭০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) শেষ পর্যন্ত এটাই চেয়েছিলেন যে এরা স্বীয় বেওফায়ী থেকে বিরত থাকুক এবং ওনার রক্ত দ্বারা ওদের হাত রক্ত রঞ্জিত না করুক। কিন্তু বদবক্তদের নসীবই খারাপ ছিল। তাই তারা জুলুম অত্যাচার থেকে বিরত রইলো না।

কাহিনী নং ৩২৮

হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু)

৩১৭ নং কাহিনীতে হুর সম্পর্কে কিছু আলোকপাত করা হয়েছে। হুর বড় সৌভাগ্যবান ছিলেন। ইবনে সাদের অধীনে হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু

আনহু) এর বিরুদ্ধে মুকাবিলা করতে এসেছিলেন। কিন্তু ওনার তকদীরে অন্য কিছু লিখা ছিল। হযরত ইমাম হোসাইনের বন্ধু বান্ধব ও সাহায্যকারীগণ যখন ইয়াযিদ বাহিনীর সাথে যুদ্ধ করে শহীদ হয়ে গেলেন এবং হযরত ইমাম হোসাইনের সাথে কেবল ভাই, ভাইপো, ভাগিনা, ছেলে ও তিনজন খাদেম ব্যতীত আর কেউ অবশিষ্ট ছিল না, তখন তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁদে দিলেন এবং চিৎকার করে বললেন هَلْ مِنْ مُغِيْثٍ يُغِيْثُنَا আমার ফরিয়াদ শ্রবণকারী এবং সাহায্যকারী কি কেউ আছে?

এ ব্যথাতুর আওয়াজ হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কানে পৌছলে তাঁর হৃদয় ব্যাকুল হয়ে উঠে এবং কাল বিলম্ব না করে স্বীয় ঘোড়ার লাগাম দোযখের দিক থেকে জান্নাতের দিকে করে দিলেন অর্থাৎ ইবনে সাদের বাহিনী থেকে বের হয়ে ঘোড়া হাঁকিয়ে হযরত ইমাম হোসাইনের খেদমতে হাজির হয়ে গেলেন এবং ইমাম হোসাইনের ঘোড়ার রেকাবে চুমু দিয়ে আরয করলেন, আমার অপরাধ কি মাফ হবে এবং আমার তওবা কি কবুল হবে? হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) ওনার মাথায় হাত মুবারক বুলায়ে বললেন, আল্লাহ তাআলা তাঁর বান্দাদের তওবা কবুল করেন। আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। হযরত হুর এ খোশ খবর পেয়ে ইমামের বাহিনীতে শামিল হয়ে যান।
(তাজকিরা ৭৩ পৃঃ)

সবকঃ যার নসীব ভাল সে কোন এক সময়ে গোমরাহী থেকে হেদায়াতের দিকে এসে যায়।

কাহিনী নং ৩২৯

হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শাহাদত

হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু) ইয়াযিদী বাহিনী থেকে বের হয়ে হোসাইনী বাহিনীর সাথে মিলিত হন এবং নিজেকে আগুন থেকে রক্ষা করে জান্নাত ক্রয় করে নেন। তিনি খুবই বাহাদুর ও সাহসী ছিলেন এবং ইবনে সাদের সেনাবাহিনীর অন্যতম সেনাপতি ছিলেন। ইবনে সাদ যখন ওনাকে হোসাইনী পক্ষে যোগদান করতে দেখলেন তখন সে খুবই ঘাবড়িয়ে গেল এবং সিফওয়ানকে বললো, তুমি গিয়ে ওকে বুঝায়ে সুজায়ে ফিরায়ে আনতে চেষ্টা কর, অন্যথায় দেহ থেকে মস্তক

আলাদা করে ফেল। সিফওয়ান হুরের কাছে গিয়ে বললো, তুমি একজন বুদ্ধিমান ব্যক্তি হয়ে ইয়াযিদের মত শক্তিশালী শাসকের পক্ষ ত্যাগ করে হোসাইনের পক্ষে কেন চলে আসলে? চলো, ফিরে চলো। হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, এখন আমি ফিরে যেতে পারি না। সিফওয়ান জিজ্ঞেস করলো, কেন? তিনি বললেন, দ্বীনের পক্ষ ছেড়ে কেন গোমরাহীর পক্ষে যাব? হযরত মুহাম্মদ মুস্তফাকে কাঁদায়ে কি ইয়াযিদকে হাসাবো? আমি কি দুনিয়াবী শাসকের প্রতি সহানুভূতি দেখাবো? আর হযরত ফাতেমাতুজ জোহরার কান্নার প্রতি কোন ভ্রুক্ষেপ করবো না?

হে সিফওয়ান, ইয়াযিদ হচ্ছে নাপাক আর হোসাইন হচ্ছে পাক এবং মুস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বাগানের ফুল। সিফওয়ান রাগান্বিত হয়ে হুরের প্রতি তীর নিক্ষেপ করলো। হুর সেই তীর থেকে নিজেকে রক্ষা করে ওর প্রতি পাল্টা এমন এক তীর নিক্ষেপ করলো যে যেটা ওর বুক ভেদ করে বের হয়ে গেল এবং সে সেখানেই মারা গেল। এ অবস্থা দেখে সিফওয়ানের ভাই দৌড়ে আসলো। হুর ওকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। অতঃপর ওখান থেকে ফিরে এসে ইমাম হোসাইনের কাছে এসে আরয করলেন, হুযুর এখন কি আপনি আমার উপর সন্তুষ্ট? ইমাম হোসাইন বললেন, নিশ্চয় আমি তোমার প্রতি সন্তুষ্ট। তোমার আম্মা যে তোমার নাম হুর (আযাদ) রেখেছে সেটা সার্থক। হুর এ কথা শুনে পুনরায় ইয়াযিদী বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং যে দিকে হামলা করলেন সেদিকে লাশের স্তুপ পড়ে গেল। এক ইয়াযিদী পিছন থেকে এসে তাঁর ঘোড়াকে আহত করলো। তিনি মাটিতে নেমে মুকাবিলা করতে লাগলো। ইমাম হোসাইন ওনাকে এ অবস্থায় দেখে আর একটি ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন। তিনি সেটার উপর আরোহণ করলেন কিন্তু জালিমেরা হঠাৎ ব্যাপক আক্রমণ করে বসলো। তিনি একবার ইমাম হোসাইনের খেদমতে হাজির হওয়ার মনস্থ করলেন কিন্তু অদৃশ্য থেকে আওয়াজ আসলো, এখন যেও না। আমি তোমার অপেক্ষায় আছি। তখন হুর ওখান থেকে চিৎকার করে বললেন, হে ইবনে রসুল, এ গোলাম আপনার নানা জানের কাছে চলে যাচ্ছে। কিছু বলার থাকলে বলে দিন। ইমাম হোসাইন কেঁদে দিয়ে বললেন, আমিও তোমার পিছে পিছে আসতেছি। এর অল্পক্ষণ পরেই জালিমদের অবিরাম আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিতে পড়ে গেলেন এবং ইমাম হোসাইনকে ডাক দিলেন। হযরত হোসাইন আওয়াজ শুনে দৌড়ে আসলেন এবং ওনাকে উঠায়ে তাঁর তাঁবুর কাছে নিয়ে গেলেন এবং তাঁর জানুর উপর ওনার মাথা

রেখে চেহারার ধূলাবালি পরিস্কার করতে লাগলেন। হুর চোখ খুললেন এবং তাঁর মস্তক ইমামের জানুর উপর দেখে একটু মুচকি হেসে জান্নাতে চলে গেলেন। (সিররুশ শাহাদাতাইন- ২২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত হুর (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বীয় নামানুসারে বাস্তবিকই জাহান্নাম থেকে মুক্ত এবং জান্নাতের অধিকারী হয়ে গেলেন এবং দুনিয়াবাসীকে এ শিক্ষা দিয়ে গেছেন যে, এ দুনিয়ার অবস্থান সাময়িক ব্যাপার মাত্র। একদিন মৃত্যুবরণ করতে হবে। তাই এ রকম মৃত্যুবরণ করা চাই যাতে আল্লাহ ও রসূল সন্তুষ্ট হন এবং পরকাল সুখের হয়।

কাহিনী নং ৩৩০

দুই সিংহ শাবক

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সহচর ও বন্ধু বান্ধব সবাই যখন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন ইমামের আপন বিধবা বোন হযরত যয়নব (রাদি আল্লাহু আনহা) দুই এয়াতিম ছেলে হযরত আউন এবং হযরত মুহাম্মদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা) মা ও মামার অনুমতি নিয়ে নারায়ে তাকবীর শ্লোগান দিয়ে ঘোড়া হাঁকায়ে দুশমনদের দিকে এগিয়ে গেলেন। দুশমনদের পক্ষ থেকে বৃষ্টির মত নিক্ষেপিত তীর ঢাল দিয়ে প্রতিহত করে ওদের সামনে গিয়ে হুংকার দিয়ে বললেন, দেখি এমন কোন্ বাহাদুর আছে, আমাদের সামনে আসুক। কেউ ওদের সামনে আসতে সাহস পেল না। ওরা শত্রুবাহিনীর অভ্যন্তরে ঢুকে কয়েকজনকে খতম করে দিল এবং বীর বিক্রমে উভয়ে এক সাথে লড়তে লাগলেন। উভয়ের যৌথ আক্রমনের সামনে টিকতে না পেরে শত্রুবাহিনী এমন পলিসি অবলম্বন করলো যে দু'জন একে অপর থেকে পৃথক হয়ে গেল। এর পরও ওনাদের সামনে এসে কেউ লড়ার সাহস করলো না। পিছন থেকে অগণিত তীর নিক্ষেপ করে শরীর ঝাঁঝরা করে দিল। ফলে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। এ দৃশ্য দেখে ইমাম হোসাইন দৌড়ে আসলেন। তাঁকে দেখে উভয়ে চোখ খুললেন এবং মুচকি হেসে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন।

(তনকীহুশ শাহাদাতাইন - ৭১ পৃঃ)

সবকঃ আহলে বায়তের ছোট বড় সবাই সাহসী ও বাহাদুর ছিলেন। আল্লাহর

পথে মৃত্যুবরণের জজ্‌বা ওনাদের মধ্যে পরিপূর্ণভাবে মওজুদ ছিল। তাঁরা পবিত্র দ্বীনের খাতিরে সবকিছু কুরবানী করে দিয়েছিলেন। তাঁদের এ কুরবানী থেকে আমাদের শিক্ষা গ্রহণ করা উচিত।

কাহিনী নং ৩৩১

আরযক পালোয়ান

কারবালা ময়দানে যখন ইমাম হোসাইনের সমস্ত বন্ধুবান্ধব শহীদ হয়ে গেলেন, তাঁর ভাগিনাদ্বয়ও শাহাদত বরণ করলেন, তখন হযরত ইমাম হাসানের সাহেবজাদা হযরত কাসেম (রাদি আল্লাহু আনহু) যুদ্ধের ময়দানে এগিয়ে গেলেন। তাঁকে দেখে ইয়াযিদী বাহিনীতে বিচলিতভাব দেখা গেল। ইয়াযিদী বাহিনীতে আরযক পালোয়ান নামে এক ব্যক্তি ছিল, যাকে মিশর ও সিরিয়ার লোকেরা এক হাজার যুবকের সমশক্তির অধিকারী মনে করতো। এ ব্যক্তি এয়াযিদ থেকে বাৎসরিক দু'হাজার দিনার পেত। সে তার চার শক্তিশালী ছেলেসহ কারবালা ময়দানে এসেছিল ইয়াযিদের পক্ষে যুদ্ধ করার জন্য। ইমাম কাসেম ময়দানে আসার পর যখন কেউ তাঁর মুকাবিলায় এগিয়ে যেতে সাহস করছিল না, তখন ইবনে সাদ আরযককে বললো, কাসেমের মুকাবিলায় তুমি যাও। আরযক এতে অপমান বোধ করলো এবং বাধ্য হয়ে তাঁর বড় ছেলেকে এ বলে পাঠিয়ে দিল যে আমার যাবার কি প্রয়োজন, আমার ছেলে এক্ষুনি কাসেমের মাথা নিয়ে আসতেছে। ওর ছেলে হযরত কাসেমের সাথে মুকাবিলা করতে গিয়ে বড় জিল্লতীর সাথে ওনার হাতে মারা গেল এবং হযরত কাসেম ওর তলোয়ারটা হস্তগত করে দ্বিতীয় কেউ থাকলে ওনার সামনে আসার জন্য আহবান জানালেন। আরযক তার ছেলেকে এভাবে মরতে দেখে খুবই কান্নাকাটি করলো এবং রাগে অস্থির হয়ে দ্বিতীয় ছেলেকে পাঠিয়ে দিল। হযরত কাসেম তাকেও জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। আরযক আরও অস্থির হয়ে তৃতীয় ছেলেকে পাঠালো। সেও রক্ষা পেল না। এবার চতুর্থ ছেলেকে পাঠালো, সেও কাসেমের হাত থেকে বাঁচতে পারলো না। আরযক এ অবস্থা দেখে হতভম্ব হয়ে গেল এবং রাগে পাগলের মত হয়ে নিজেই ইমাম কাসেমের সামনে হাজির হলো। হযরত ইমাম হোসাইন হযরত কাসেমের মোকাবিলায় আরযককে দেখে আল্লাহর দরবারে হাত উঠালেন এবং প্রার্থনা করলেন, হে আল্লাহ! আমার কাসেমের সম্মান তোমার হাতে। চারিদিক থেকে

লোকেরা উভয়ের লড়াই দেখতে লাগলো। আরযক পরপর বারটি তীর নিক্ষেপ করলো। হযরত কাসেম সবকটি প্রতিহত করলেন। এতে সে ক্রোধান্বিত হয়ে ঘোড়ার পিঠে তীর নিক্ষেপ করলো এবং ঘোড়া পড়ে গেল। হযরত কাসেম মাটিতে দাঁড়িয়ে গেলেন। হযরত ইমাম হোসাইন সঙ্গে সঙ্গে আর একটা ঘোড়া পাঠিয়ে দিলেন। হযরত কাসেম ঘোড়ায় আরোহণ করে পরপর তিনটি তীর নিক্ষেপ করলেন। আরযক এগুলো প্রতিহত করলো এবং তলোয়ার বের করলো। হযরত কাসেমও তলোয়ার বের করলেন। হযরত কাসেমের হাতের তলোয়ারটা দেখে আরযক বলে উঠলো এটাতো আমার তলোয়ার, আমি এটা এক হাজার দিনার দিয়ে ক্রয় করেছি এবং এক হাজার দিনার দিয়ে সান দিয়েছি। এ তলোয়ার তোমার হাতে কি করে এসেছে? হযরত কাসেম বললেন, এটা তোমার বড় ছেলে আমাকে দিয়ে গেছে এর মজাটা তোমাকে দেখানোর জন্য। সাথে সাথে এটাও বললেন, তুমি একজন বিখ্যাত সৈনিক হয়ে এ রকম অসতর্কমূলক কাজ কিভাবে কর। ময়দানে যুদ্ধ করতে এসেছ কিন্তু ঘোড়ার লাগামটা আঁটসাঁট করে বাঁধনি। যার ফলে রশিটা ঢিলা হয়ে রয়েছে। আরযক যে মাত্র সেটা দেখার জন্য ঝুঁকলো, হযরত কাসেম আল্লাহর নাম নিয়ে তলোয়ারের এমন এক কোপ মারলেন যে আরযক দু'টুকরো হয়ে গেল।

(তাজকিরা- ৮০ পৃঃ)

সবকঃ আহ্‌লে বায়তের সবাই যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। আমাদেরও যুদ্ধ বিদ্যায় অবহিত থাকা উচিত যেন প্রয়োজনে বাতিলদের দাঁত ভাঙ্গা জবাব দেয়া যায়।

কাহিনী নং ৩৩২

ঝাণ্ডাবাহীর শাহাদত

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বন্ধুবান্ধব, ভাগিনে, ভাইপো সবাই যখন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন ঝাণ্ডাবাহী হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) ইমামের সামনে হাজির হলেন এবং বললেন, এবার আমাকে যুদ্ধে যেতে অনুমতি দিন। এখনতো চূড়ান্ত পর্য্যায়ে পৌঁছে গেছে। জালিমরা আমাদের সবাইকে শহীদ করে দিয়েছে, যে কয়েকজন বেঁচে আছে তারাও তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেছে। তৃষ্ণাতুর ছোট ছোট শিশুদের দেখে আমার সহ্য হচ্ছে না। আমি পানি আনার জন্য ফোরাত নদীতে যাচ্ছি। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)

ভাইকে কয়েকটি উপদেশ দিয়ে বিদায় দিলেন। হযরত আব্বাস মশক নিয়ে ফোরাতের দিকে যাত্রা দিলেন। চার হাজার ইয়াযিদী সৈন্য ফোরাত নদী ঘিরে রেখেছিল। যে মাত্র হযরত আব্বাস ফোরাতে কদম রাখলেন, জালিমরা তাঁকে ঘিরে ফেললো। তিনি ওদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমরা মুসলমান, নাকি কাফির? ওরা বললো, আমরা মুসলমান। তিনি বললেন, যে নদীর পানি পশু পাখি পান করতে পারে, সে নদীর পানি কি মোস্তফা (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বংশধরদের জন্য বন্ধ করে দেয়া জায়েজ আছে? তোমরা কি কিয়ামতের তৃষ্ণার ভয় করো না? নবী বংশধর সবাই তৃষ্ণার্থ, ছোট ছোট শিশুরা তৃষ্ণায় কাতর হয়ে গেছে। এত কিছু বলার পরও ওদের মনে কোন রহম সৃষ্টি হলো না এবং সবাই একযোগে ওনার উপর আক্রমণ করলো। তিনিও সাথে সাথে পাল্টা আক্রমণ করে ওদের আশিজনকে হত্যা করলেন এবং বাকীদের ছত্রভঙ্গ করে ফোরাত নদী পর্যন্ত পৌঁছলেন এবং নদীতে নেমে মশকে পানি ভরলেন এবং নিজ হাতে এক অঞ্জলী পানি নিয়ে পান করতে চাইলেন কিন্তু ভাই বোন ও শিশুদের কথা মনে উদিত হওয়ায় সেই পানি ফেলে দিয়ে মশক নিয়ে রওয়ানা হলেন। ফেরার পথে পুনরায় জালিমরা ঘিরে ফেললো। তিনি বীর বিক্রমে জালিমদের অবরোধ ভেদ করে মশক নিয়ে সামনের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন। কিন্তু নওফল নামে এক জালিম পিছন থেকে তলোয়ারের কোপ দিল এবং তীর দিয়ে মশক ফুটা করে দিল। এতে হাত কেটে গেল এবং মশকের পানি পড়ে গেল। এটা দেখে তিনি নিজের কষ্ট ও শিশুদের তৃষ্ণার কথা চিন্তা করে কেঁদে দিলেন এবং কর্তিত হাতের যন্ত্রনায় অস্থির হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। পড়ে যাবার সময় ইমাম হোসাইনকে ডাক দিলেন। ইমাম হোসাইন ওনার আওয়াজ শুনে এমন জোরে 'আহ' বলেছিলেন যে এতে কারবালার ময়দান কেঁপে উঠেছিল। তিনি তাড়াতাড়ি ভাই এর দিকে ছুটে গেলেন এবং হযরত আব্বাসকে রক্ত রঞ্জিত অবস্থায় মাটিতে গড়াগড়ি করতে দেখে বলে উঠলেন اَلْآنَ اِنْكَسَرَ ظَهْرِىْ এখন আমার ঢাল ভেঙ্গে গেল। হযরত আব্বাস তাঁর দিকে এক নজর তাকায়ে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করলেন। হযরত ইমাম হোসাইন ওনার লাশ তাঁবুর কাছে নিয়ে আসলেন এবং বলতে লাগলেন, আব্বাসের পর আমার সহযোগী ও সহানুভূতিকারী বলতে আর কেউ নেই। সবাই আমাকে একাকী ফেলে জান্নাতে চলে গেছে। এখন জালিমদের সামনে আমাকেই এগিয়ে যেতে হবে।

(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ১৯৪ পৃঃ)

সবক ঃ ইয়াযিদী বাহিনী বড় জালিম ও অপরিনামদর্শী ছিল। কিয়ামতের ভয়াল দিনের কথা আদৌ স্মরণ রাখে নি। অথচ কিয়ামতের সেই ভয়াল দিনের কথা মুসলমানদের কখনো না ভুলা চাই। হযরত ইমাম হোসাইন ও তাঁর সহযোদ্ধাগণের শাহাদাতের একটি শিক্ষা এটাও ছিল যে এ কয়েক দিনের জিন্দেগীতে আমরা যেন কিয়ামতের কথা না ভুলি।

কাহিনী নং ৩৩৩

হযরত আলী আকবর

সকল বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন শাহাদাত বরণ করার পর ইমাম হোসাইনের সাথে তাঁর তিন সন্তান ব্যতীত আর কেউ রইল না। সন্তানদের মধ্যেও হযরত জয়নাল আবেদীন ছিলেন অসুস্থ এবং হযরত আলী আসগর ছিলেন ছয়মাস বয়সী। একমাত্র আটার বছর বয়সী হযরত আলী আকবর ছিলেন তাঁর সহায়। হযরত ইমাম হোসাইন যখন দেখলেন তাঁর এ তিন সন্তান ছাড়া আর কোন পুরুষ বাকী নেই, তখন তিনি যা আছে তা দিয়ে নিজেকে সজ্জিত করলেন এবং বিদায় নেয়ার জন্য তাঁবুর অভ্যন্তরে গেলেন।

হযরত আলী আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এ দৃশ্য দেখে ইমামের কদমে পতিত হলেন এবং অরয করলেন, আব্বাজান আপনি আমার সামনে শাহাদাত বরণ করবেন, এটা সহ্য করতে পারবো না। আল্লাহ আমাকে এ দৃশ্য যেন না দেখায়। আমার বর্তমানে আপনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবেন, তা কিছুতেই হতে পারে না। আপনি আমাকে অনুমতি দিন। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, হে আলী, আমার মনতো চাচ্ছে না তোমাকে বিদায় দিতে, কোন্ চোখে দেখব তোমার ক্ষতবিক্ষত শরীর। হযরত আলী আকবর কিন্তু অটল; তিনি ইমামকে কসম দিলেন এবং নিজে আগে যুদ্ধ ক্ষেত্রে যাবার জন্য কাঁদতে শুরু করলেন। শেষ পর্যন্ত ইমাম অনুমতি দিলেন এবং নিজ হাতে ওনাকে যুদ্ধের জন্য সজ্জিত করে দিলেন। আহলে বাইতের মহিলারা এসে ওনাকে জড়িয়ে ধরেছিলেন। ইমাম হোসাইন সবাইকে হটিয়ে দিলে বললেন, ওকে যেতে দাও। সে পরপারের দিকে যাত্রা দিচ্ছে।

(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ১৯০পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় ধৈর্যশীল ও সহনশীল ছিলেন। আল্লাহর পথে কুরবানীর জন্য তিনি নিজ হাতে তাঁর প্রাণ প্রিয় ছেলেকে যুদ্ধক্ষেত্রে যাবার জন্য সজ্জিত করে দিলেন। কোন প্রকারের আপত্তি ও অভিযোগের শব্দ মুখে আনেননি।

কাহিনী নং ৩৩৪

হযরত আলী আকবরের শাহাদত

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাহেবজাদা হযরত আলী আকবর যখন যুদ্ধ ক্ষেত্রে গেলেন তখন শত্রুবাহিনীর মধ্যে আতঙ্ক ছড়িয়ে পড়লো। হযরত আলী আকবরের বয়স ছিল আঠার বছর। তাঁর চেহারা ও আকৃতির মধ্যে অনেকটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাথে মিল ছিল। তিনি যুদ্ধ ক্ষেত্রে গিয়ে তাঁর সাথে লড়ার জন্য শত্রুবাহিনীকে আহবান করলেন। যখন কেউ এগিয়ে আসলো না, তখন তিনি শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন এবং শত্রুবাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে দিলেন। বেশ কিছুক্ষণ লড়ার পর তৃষ্ণায় কাতর হয়ে ইমামের খেদমতে উপস্থিত হলেন এবং তৃষ্ণার কথা বললেন। হযরত ইমাম হোসাইন ওনার চেহারা মুবারক থেকে ধূলাবালি পরিস্কার করে ওনার মুখে হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আংটি রাখলেন। এতে ওনার তৃষ্ণা নিবারণ হলো এবং পুনরায় ময়দানে ফিরে গেলেন। অনেককে জাহান্নামে পাঠিয়ে পুনরায় আব্বাজানের কাছে ফিরে এসে তৃষ্ণার কথা বললেন। হযরত ইমাম হোসাইন কেঁদে বললেন, বাবা দুঃখ কর না অতি শীঘ্র হাউজে কাউসারের পানিতে তোমার তৃষ্ণা নিবারণ হবে। হযরত আলী আকবর এ সুখবর পেয়ে পুনরায় যুদ্ধক্ষেত্রে গেলেন এবং শত্রু বাহিনীর উপর ঝাঁপিয়ে পড়ে অনেককে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিলেন। শত্রুরা অবস্থা বেগতিক দেখে তাঁকে চারদিক থেকে ঘিরে ফেললো এবং ইবনে নমির নামে এক জালিম তাকে এমন এক তীর নিক্ষেপ করলো যেটা তাঁর পিঠ ভেদ করে বের হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি ঘোড়া থেকে পড়ে যান। সেই সময় তিনি ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু)কে ডাক দিয়ে বললেন يَا اَبَتَـا اَدْرِكْنِيْ (আব্বাজান! আপনার আলী আকবরের খবর নিন)

ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) স্বীয় কলিজার টুকরার এ আওয়াজ শুনে দৌড়ে গেলেন এবং দেখেন যে আলী আকবর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে মাটিতে পড়ে রয়েছে। ইমাম হোসাইন ওখানে বসে তাঁর জানুর উপর ওনার মাথা রাখলেন। হুস আসলে আলী আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) চোখ খুলে বললেন, আব্বাজান ঐ দেখুন, দাদাজান দু'গ্লাস শরবত নিয়ে দাঁড়িয়ে আছেন, আমাকে এক গ্লাস দিচ্ছেন, আমি দু'গ্লাস দিতে বলছি, কেননা আমি খুবই তৃষ্ণার্ত। তিনি বলেন, তুমি এক গ্লাসই পান কর, অপর গ্লাস তোমার আব্বার জন্য। সেও খুবই তৃষ্ণার্ত, এটা সে পান করবে। এতটুকু বলেই ওখানেই শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। (তনকীহুশ শাহাদাতাইন- ১৯৯ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) কারবালা ময়দানে অনেক বড় পরীক্ষা দিয়েছেন এবং সেই পরীক্ষায় তিনি অনেক বড় কামিয়াবী হাসিল করেন।

কাহিনী নং ৩৩৫

এয়াতীম

হযরত আলী আকবরের শাহাদাতের পর হযরত ইমাম হোসাইন একেবারেই একাকী হয়ে গেলেন। হযরত জয়নাল আবেদীন ছিলেন অসুস্থ এবং আলী আসগর ছিলেন ছয় মাসের শিশু। তাই হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজেই যুদ্ধ ময়দানে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন এবং তাঁবুর অভ্যন্তরে গিয়ে আহলে বায়তের সবাইকে ধৈর্যধারণ করার জন্য উপদেশ দিলেন এবং সবাইকে সাবধান করে বললেন, আমি যে ধরনের মসীবতে পতিত হইনা কেন, আমার শোকে মাথার চুল ছিঁড়ে ফেল না, মুখে থাপ্পর মার না এবং বুকে আঘাত কর না। শরীয়তে এ সব কিছু জায়েজ নেই। তবে অধিক শোকে চোখের পানি ফেলতে পার, কান্না নিষেধ নয়। অতঃপর তিনি হযরত সকিনাকে কোলে নিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং নিজের বোন হযরত জয়নাবকে বললেন, বোন তুমি ওর দেখাশুনা করিও। এরপর সকিনাকে বললেন, মা, আজ সন্ধ্যার মধ্যে তুমি এয়াতিম হয়ে যাবে। হযরত সকিনা ছোট্ট হাত দু'টি জোড় করে বললো, আব্বু এয়াতীম কাকে বলে? ইমাম চোখের জলে বুক ভাসায়ে বললেন, আম্মু যার বাপ মারা যায় সে হয় এয়াতীম। (তনকীহুশ শাহাদাতাইন ২০০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শেষ উপদেশ ছিল বলা-মসীবতের সময় ধৈর্য ধারণ করা। আমাদেরকে সে অনুযায়ী আমল করা উচিত। এটাও বুঝা গেল যে ইমাম হোসাইন আল্লাহর খাতিরে ছোট ছোট শিশুদের মহব্বতও কুরবানী করে দিয়েছেন।

কাহিনী নং ৩৩৬

শিশু শহীদ

হযরত আলী আকবর যখন শহীদ হয়ে গেলেন, তখন হযরত ইমাম হোসাইন আহলে বায়তের সবাইকে শান্তনা দিয়ে যুদ্ধ ময়দানে যাবার জন্য প্রস্তুতি নিলেন। হঠাৎ তাঁবুর অভ্যন্তরে কান্নার আওয়াজ শুনে তাঁবুর দিকে এগিয়ে গেলেন এবং জানতে পারলেন যে দুগ্ধপোষ্য শিশু হযরত আলী আসগর তৃষ্ণায় অস্থির হয়ে ছটফট করছেন। ছয় মাসের শিশু তিনদিন যাবত ক্ষুধা ও তৃষ্ণায় একেবারে কাহিল হয়ে পড়েছে। জিহ্বা মুখের বাইরে এসে গেছে, মাছের মত ছটফট করছে। ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, আলী আসগরকে আমার কোলে দাও। হযরত যয়নাব আলী আসগরকে এনে ইমামকে দিলেন। তিনি ওকে কোলে নিয়ে জালিমদের সামনে গিয়ে বললেন, তোমাদের কাছে অপরাধী হলাম আমি, কিন্তু আমার এ শিশুতো মাছুম। আল্লাহর ওয়াস্তে ওর প্রতি একটু সহানুভূতি কর। আমার ছোট্ট শিশুকে একটু পানি দাও। আমি তোমাদের কাছে ওয়াদা করছি যে আজ এ শিশুকে যে একটু পানি পান করাবে, কাল কিয়ামতে ওকে আমি হাউজে কাউসারের পানি পান করাবো।

ইমামের এ ব্যথাতুর আহব্বান শুনার পরও জালিমদের পাষাণ হৃদয় একটুও নরম হলো না। হরমেলা বিন কাহিল নামে এক জালিম আলী আসগরকে লক্ষ্য করে এক তীর নিক্ষেপ করলো, সেটা আলী আসগরের গলা ভেদ করে ইমামের বগল দিয়ে বের হয়ে গেল। আহ! ক্ষত স্থান থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো এবং অসহায় দৃষ্টিতে ইমামের দিকে তাকিয়ে রইলো। ইমাম অস্থির হয়ে স্বীয় পবিত্র মুখ শিশুর মুখে দিয়ে বুকে জড়িয়ে ধরলেন এবং এ অবস্থায় স্বীয় আব্বাজানের কোলে শাহাদাত বরণ করেন। ইমাম ওকে তাঁবুতে নিয়ে এসে ওর মায়ের কোলে দিলেন এবং বললেন আলী আসগর হাউজে কাউসারের পানি পান করে পরিতৃপ্ত হয়েছে। এ শিশুর লাশ দেখে আহলে বায়তের সবাই গুঞ্জরিয়ে কেঁদে উঠলেন, ইমামের চক্ষুদ্বয় থেকেও অঝোরে অশ্রুধারা প্রবাহিত হলো। (তাজকেরা ৮৭ পৃঃ)

সবকঃ ইয়াযিদী বাহিনীর জুলুম এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে ওদের অন্তরে দয়ামায়া বলতে কিছুই ছিল না। এ ধরনের লোক আল্লাহর রহমতের আশাবাদী মোটেই হতে পারে না।

কাহিনী ৩৩৭

হযরত শহরবানুর স্বপ্ন

কারবালা ময়দানে আশুরার রাতে হযরত শহরবানু একটি স্বপ্ন দেখলেন যে এক নূরানী আকৃতির সম্মানিত মহিলা কারাবালা ময়দান পরিষ্কার করছেন এবং ওনাকে খুবই মর্মাহত দেখাচ্ছিল। হযরত শহরবানু ওনার পরিচয় এবং এ জায়গা পরিষ্কার করার কারণ জানতে চাইলে তিনি বলেন, বেটী, আমি হুজুর শাহে দোআলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কন্যা ফাতিমা। সকালে এ জায়গায় আমার প্রিয় পুত্র হোসাইন শয়ন করবে। তাই আমি এ জায়গাটা পরিষ্কার করছি। যেন আমার ছেলের ক্ষতস্থানে কোন কংকর প্রবিষ্ট হতে না পারে।

(তানকীহুশ শাহাদাতাইন - ১১০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত শহর বানুর এ স্বপ্নে হযরত ফাতেমা যোহরা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বাস্তব মানসিক অবস্থা ফুঠে উঠেছে। হযরত ফাতেমার হৃদয়ে যারা এভাবে আঘাত দিয়েছে, তারা কিছুতেই রেহাই পেতে পারে না।

কাহিনী নং ৩৩৮

বিদায়

মুহররমের দশ তারিখ কারবালা ময়দানে যখন হযরত ইমাম হোসাইনের আত্মীয় স্বজন সব শহীদ হয়ে গেলেন, তখন ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজেই প্রস্তুতি নিলেন। মিশরী জুব্বা পরিধান করলেন, হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পাগড়ী মুবারক মাথায় বাঁধলেন, হযরত হামজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঢাল এবং হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর তলোয়ার 'জুলফিকার' হাতে নিয়ে জুলজানা ঘোড়ায় আরোহণ করে রওয়ানা হলেন। ইত্যবসরে তাঁর সাহেবজাদা হযরত জয়নাল আবেদীন (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি তখন অসুস্থ ছিলেন এবং দুর্বলতার কারণে নড়াচড়া করতে পারছিলেন না, খুবই কষ্ট করে লাঠির উপর ভর দিয়ে ইমামের সামনে এসে আরয করলেন, আব্বাজান! আমার বর্তমানে আপনি কেন যাচ্ছেন? আমাকে অনুমতি দিন, আমিও যেন জেহাদ করে শহীদ হয়ে আমার ভাইদের সাথে মিলিত হতে পারি। হযরত ইমাম হোসাইন

(রাদি আল্লাহু আনহু) এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন এবং ছেলেকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, বাবা তুমি তাঁবুর ভিতরে গিয়ে বস, শাহাদত বরণের ইচ্ছা কর না। বেটা, রসূলে মকবুল (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বংশগত সিলসিলা তোমার মাধ্যমে কিয়ামত পর্যন্ত জারি থাকবে। হযরত ইমাম হোসাইনের এ কথা শুনে ছেলে নিশ্চুপ হয়ে গেলেন। তিনি ছেলেকে প্রয়োজনীয় উপদেশ ও অসিয়ত করে সমস্ত জাহেরী ও বাতেনী জ্ঞান এবং ইমামতির ভেদ সম্পর্কে অবহিত করলেন, যেটা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) থেকে পেয়েছিলেন। ছেলেকে সব কিছু হস্তান্তর করার পর তাঁবুর অভ্যন্তরে গিয়ে সবার থেকে বিদায় নিলেন।
(তনকীহুশ শাহাদাতাইন - ৭৮ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন একান্ত অসুস্থ অবস্থায়ও জিহাদের জজবা এবং শাহাদত বরণের আগ্রহ পোষণ করতেন। কিন্তু আমাদের অনেকে আজ সম্পূর্ণ সুস্থ অবস্থায় নামাযটাও পড়ি না। হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনের অসুখের মধ্যে এ রহস্য নিহিত ছিল যে যেন তাঁর ঔরশে সিলসিলায়ে মুস্তফা জারী থাকে।

কাহিনী নং ৩৩৯

বীরত্বপূর্ণ আক্রমণ

বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সবাই শহীদ হয়ে যাবার পর হযরত ইমাম হোসাইন স্বয়ং যুদ্ধ ময়দানে গেলেন এবং ইবনে সাদের বাহিনীকে অনেক কিছু বুঝালেন। কিন্তু তারা যুদ্ধ ছাড়া অন্য কিছু মানতে রাজি নয়। সবাই তীর তলোয়ার নিয়ে একেবারে প্রস্তুত হয়ে গেল। ইমাম হোসাইনও খাপ থেকে তলোয়ার বের করলেন এবং শত্রুদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়লেন। আল্লাহ! আল্লাহ! এ আক্রমণ ভেড়ার পালে বাঘের হামলার মত ছিল। যেই তাঁর মুকাবিলায় এসেছে ওকে সাথে সাথে জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। এভাবে অনেক জালিমকে সোজাসুজি জাহান্নামে পাঠিয়ে দিয়েছেন। মোট কথা তিনি যেদিকে দৃষ্টিপাত করেছেন, সে দিকে লাইনকে লাইন উচ্ছেদ হয়ে গেছে।
(তনকীহুশ শাহাদাতাইন ৮০ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় সাহসী ও বাহাদুর এবং বাঘের বেটা বাঘ ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৪০

শেষ সাক্ষাৎ

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) একাকী যুদ্ধ ময়দানে যে বীরত্ব ও সাহসিকতা দেখালেন, এর জন্য ফিরিশতাগণ বাহ বাহ করে উঠলেন। এ বীরত্বপূর্ণ যুদ্ধ চলাকালীন ইবনে কহতবা শামী নামে এক ব্যক্তি তাঁর সামনে এসে বললো, হে হোসাইন তোমার সমস্ত বন্ধু বান্ধব ও আত্মীয় স্বজন সবাইকেতো মেরে ফেলা হয়েছে কিন্তু এর পরও কি তোমার যুদ্ধ করার স্পৃহা বজায় রয়েছে? তুমি একাকী কয়জনের সাথে যুদ্ধ করতে পারবে? ইমাম হোসাইন বললেন, তোমাদের সাথে আমি যুদ্ধ করতে এসেছি, না কি তোমরা আমার সাথে যুদ্ধ করতে এসেছ? তোমরা আমার পথ বন্ধ করে দিয়েছ, আমার আত্মীয় স্বজনকে হত্যা করেছ, এখন যুদ্ধ ছাড়া আর কি করার আছে? বেশী কথা বলো না, সামনে এসো- এ বলে এমন এক তকবীর দিলেন যে সমস্ত সৈন্য কেঁপে উঠলো এবং সেই জালিম অজ্ঞান হয়ে গেল। হাত পা নড়াচড়া করতে পারলো না। ইমাম তলোয়ারের আঘাতে ওর মাথা উড়ায়ে দিল। অতঃপর ইয়াযিদ বাহিনীর উপর হামলা করলো। এতে সবাই প্রাণভয়ে পালাতে শুরু করলো, ইবনে আস্‌তা নামে এক ইয়াযিদী জালিম ডাক দিয়ে বললো হে কাপুরুষেরা তোমরা মাত্র একজনের ভয়ে এভাবে পালাচ্ছ? দাড়াও, আমি ওর মুকাবেলায় যাচ্ছি- এ বলে, সে ইমামের সামনে গেল এবং তলোয়ার উঠালো। হযরত ইমাম হোসাইন হাত বাড়িয়ে ওর কোমরে কোপ দিয়ে ওকে দু'টুকরা করে ফেললেন। অতঃপর ইমাম ফোরাত নদীতে যাবার মনস্থ করলেন।

সীমার ডাক দিয়ে বললো, ওহে সিপাই ভাইয়েরা হোসাইনকে কিছুতেই পানি পান করতে দিও না। যদি সে পানি পান করতে পারে, তাহলে কাউকে জীবিত ছাড়বেনা। তখন সবাই মিলে ইমামের উপর আক্রমণ করে বসলো। হযরত ইমাম হোসাইন ওদেরকে কচুকাটা করে এবং ওদের বাহিনীকে ছত্রভঙ্গ করে ফোরাত নদীর কিনারে গিয়ে পৌছলেন এবং ঘোড়া সমেত পানিতে নেমে পড়লেন। যে মাত্র হাতের তালুতে পানি নিয়ে পান করতে যাচ্ছিলেন, ধোঁকাবাজরা ডাক দিয়ে বল্লো, হে হোসাইন,তুমি এখানে পানি পান করছ আর ওদিকে তাঁবু লুট হচ্ছে। এ কথা শুনে ইমাম পানি ফেলে তাঁবুর দিকে ছুটে গেলেন। তাঁবুর কাছে গিয়ে

দেখলেন সব ঠিক আছে ধোঁকাবাজরা ওনাকে ধোঁকা দিয়েছে। যাক তিনি তাঁবুর ভিতরে গেলেন এবং পরিবার পরিজনকে বললেন, হা-হুতাশ করিও না। মসীবতে ধৈর্যধারণ কর। আমার ইয়াতিম ছেলেমেয়েকে আরামে রাখিও। অতঃপর ইমাম জয়নুল আবেদীনকে বুকে জড়িয়ে ধরে কপালে চুমু দিলেন এবং বললেন, বেটা যখন মদীনায় পৌছবে আমার বন্ধু বান্ধবদেরকে আমার সালাম বলিও এবং আমার পক্ষ থেকে এ পয়গাম পৌছাইও যে যখন তাদের মধ্যে কেউ কোন কষ্ট বা মসীবতে পতিত হয় তখন যেন আমার বলা-মসীবতের কথা স্মরণ করে এবং যখন পানি পান করে তখন যেন আমার তৃষ্ণার কথা মনে করে। হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর এ শেষ দেখা দিয়ে পুনরায় ময়দানে তশরীফ নিয়ে গেলেন। (তাজকিরা ৯০ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বীরত্ব ও সাহস এবং তাঁর দৃঢ়চিত্ত কিয়ামত পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য আলোকবর্তিকা হিসেবে কাজ করবে। আত্মীয় স্বজনের নির্মম হত্যা, ক্ষুধা, তৃষ্ণা এবং জালিমদের অনবরত জুলুম অত্যাচার সত্ত্বেও তাঁর ঈমানী জজবায় সামান্যতম পার্থক্যও আসে নি। তিনি প্রত্যেক অবস্থায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করেন এবং শরীয়তের বরখেলাফ প্রতিটি কাজ থেকে বারণ করেন।

কাহিনী নং ৩৪১

কিয়ামত

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁবুতে অবস্থানরত অবশিষ্ট পরিবার পরিজনকে শেষ দেখা দিয়ে যখন যুদ্ধ ময়দানে ফিরে আসলেন তখন ইয়াযিদ বাহিনী এক সাথে তাঁর উপর আক্রমণ করলো। তিনিও নির্ভীকভাবে ওদের মুকাবেলা করলেন। কিন্তু জালিমদের অনবরত ও এলোপাতাড়ি আক্রমণে তাঁর শরীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে যায়, তাঁর ঘোড়াও কাহিল হয়ে পড়ে। শেষ পর্যন্ত তিনি এক জায়গায় দাঁড়িয়ে গেলেন। এই সুযোগে জওয়াদ নামে এক ব্যক্তি এগিয়ে এসে তাকে তলোয়ারের কোপ দিতে উদ্যত হলো। তিনি ওর হাত ধরে এমনভাবে মোছড়ালেন যে ওর হাত দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে গেল। ঐ সময় তিনি সবের দিকে এক নজর তাকিয়ে দেখলেন। কারো মধ্যে সহানুভূতির রেশমাত্র নেই। সবাই তাঁর রক্তের জন্য উদগ্রীব হয়ে রয়েছে। এরই মধ্যে জালিমরা দূর

থেকে তীর নিক্ষেপ করতে শুরু করলো। একটি তীর তাঁর নূরানী কপালে এসে বিঁধলো এবং সেখান থেকে ফিন্‌কী দিয়ে রক্ত বের হতে লাগলো। তিনি সেই রক্ত হাত দিয়ে সারা মুখমণ্ডলে লাগিয়ে দিলেন এবং বললেন, কাল কিয়ামতের দিন এ অবস্থায় নানাজানের কাছে যাব এবং আক্রমাণকারীদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করবো। ঐ সময় তাঁর শরীরে তীর ও তলোয়ারের বাহাত্তরটির মত আঘাত লেগেছিল। যার ফলে তিনি ক্রমান্বয়ে দুর্বল হয়ে আসছিলেন। তিনি কিবলামুখি হয়ে আল্লাহকে স্মরণ করতে লাগলেন এবং আরয করলেনঃ

হে আল্লাহ! তোমার অসহায় বান্দাকে সাহায্য কর। এ সংকটজনক অবস্থায়ও যেন ধৈর্যধারণ করতে পারি, সেই তৌফিক দান কর। হে আল্লাহ! তলোয়ারের নীচেও যেন আমার মুখে তোমার নাম জারী থাকে। জানি না আমার তকদীরে কি লিখা আছে। তবে হে মওলা, তকদীরে যা লিখা আছে আমি সেটার উপর রাজি।

ইত্যবসরে এক জালিমের তীর এসে তাঁর গলায় বিদ্ধ হলো এবং যর্‌আ বিন শরীক তার হাতের উপর এবং সীমার তাঁর মাথায় তলোয়ারের আঘাত করলো এবং সেতান বিন আনস তার পিঠে তীর নিক্ষেপ করলো। এভাবে আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে ঘোড়া থেকে পড়ে গেলেন। তখন দ্বিপ্রহর অতিক্রম করে ছিল এবং জোহরের সময় হয়েছিল। হযরত ইমাম হোসাইন ঐ অবস্থায় নামায আদায় করলেন। ঘোড়া থেকে পতিত হওয়ার সময় কেবলামুখি ছিলেন। ঘোড়ার উপর যখন ছিলেন তখন তাঁর অবস্থানটা নামাযে দন্ডায়মান, ঘোড়া থেকে পড়ে যাবার সময়টা ছিল রুকুর পর্যায় এবং মাটিতে পতিত হওয়ার পরের অবস্থানটা ছিল সিজদারত। এ সুযোগে সীমার এসে তাঁর বুকের উপর বসলো। ইমাম চোখ খুলে জিজ্ঞেস করলেন, তুমি কে? সে বললো, আমি সীমার। ইমাম হোসাইন বললেন, তোমার বুকটা একটু দেখাও। সে বুক খুলে দেখালে তথায় সাদা দাগ দেখতে পেলেন। এতে তিনি বলে উঠলেন। صَدَقَ جَدِّىْ رَسُوْلُ اللّٰهِ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ আমার নানাজান ঠিকই বলেছেন। রাত্রে নানাজান স্বপ্নে আমার হত্যাকারীর যে লক্ষণের কথা বলেছেন, সেটা তোমার মধ্যে বিদ্যমান আছে। অতঃপর তিনি সীমারকে বললেন, সীমার তুমি বলতে পার আজ কি বার? সে বললো, জুমাবার। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, এখন কোন্ সময়? সীমার বললো, খোতবা পাঠ ও জুমার নামায আদায় করার সময়। ইমাম বললেন, এ সময়

খতীবগণ নিশ্চয় খোতবা দিচ্ছেন, আমার নানাজানের গুণকীর্তন করছেন, তাঁর উপর দরূদ শরীফ পাঠ করছেন আর তুমি সেই সময় তার দৌহিত্রের সাথে এ আচরণ করছ। যেখানে রাসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) চুমু দিতেন সেখানে তুমি তলোয়ার চালাতে চাচ্ছ। দেখ, এ সময় আমি আমার ডান দিকে নিরপরাধ জকরীয়া আলাইহিস সালাম ও বামদিকে নিরপরাধ ইয়হিয়া আলাইহিস সালামকে দেখতেছি। হে সীমার, আমার বুক থেকে একটু সরে দাঁড়াও। এখন নামাযের সময়, আমি কিবলামুখি হয়ে নামায পড়বো। তুমি আমার নামাযরত অবস্থায় যা ইচ্ছে তা কর। নামাযে আহত হওয়া আমার আব্বাজানের উত্তরাধীকার। সীমার তাঁর বুক থেকে নেমে গেল, তিনি কিবলামুখী হয়ে সিজদায় পতিত হয়ে আল্লাহর ধ্যানে মশগুল হলেন। এ সুযোগে সীমার তাঁর শরীর থেকে মাথা আলাদা করে ফেলে। সেই দিনটা ছিল ১০ই মুহররম শুক্রবার, ৬০ হিজরী। তাঁর বয়স হয়েছিল ৫৬ বছর ৫ মাস ৫ দিন।
(তাজকিরা ৮৯-৯৪ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর উপর জালিমরা যে পরিমাণ অত্যাচার জুলুম চালিয়েছে, তিনি সে পরিমাণ সবর ও শুকরীয়া আদায় করেছেন। তিনি সর্ব অবস্থায় আল্লাহকে স্মরণ করেছেন। এক মুহূর্তের জন্যও আল্লাহকে ভুলেন নি। শেষ সময় যখন তাঁর শরীর আঘাতে আঘাতে জর্জরিত হয়ে গিয়েছিল এবং তিনি একেবারে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন, তখনও তিনি নামাযের কথা ভুলেন নি এবং নামাযের অবস্থায় শাহাদ'ত বরণ করেন। আজ যারা অবহেলা করে নামায পড়ে না, যারা সারা জীবন হারাম কাজে নিয়োজিত রয়েছে, মদ, গাঁজার নিশায় মত্ত এবং শরীয়ত বিরোধী কার্যকলাপে ব্যস্ত, তারা কি করে ইমাম হোসাইনের ভক্ত বলে দাবী করতে পারে? আমাদের উচিত যে, ইমাম হোসাইনের প্রিয় চরিত্রকে সামনে রাখা। অনাচার অবিচারের বিরুদ্ধে সংঘবদ্ধ হওয়া এবং সত্যবাণী প্রচার ও প্রসারের জন্য বাতিলের মোকাবিলায় অবিচল থাকা এবং সদা আল্লাহকে স্মরণ রাখা এবং নামাযের একান্ত অনুসারী হওয়া। বড় বড় মসীবতের সময়েও যেন নামায ত্যাগ না করা।

কাহিনী নং ৩৪২

উম্মুল মুমেনীনের স্বপ্ন

এক মহিলা রাবী বর্ণনা করেছেন , আমি উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাদি আল্লাহু আনহা) এর ঘরে গিয়ে দেখলাম যে তিনি কাঁদতেছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম আপনি কেন কাঁদতেছেন? তিনি বললেন, আমি এ মাত্র হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্ন দেখেছি। তাঁর পবিত্র মস্তক ও পশমে ধূলাবালি দেখে আরয করলাম, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আপনার এ অবস্থা কেন? তিনি ফরমালেন, আমি এ মাত্র কারবালা থেকে আসতেছি। আজ আমার হোসাইনকে হত্যা করে ফেলা হয়েছে। (তিরমীজি শরীফ ২১৮ পৃঃ ২ খণ্ড)

সবকঃ হযরত ইমাম হোসাইনের শাহাদতের সময় হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) শাহাদত গাহে উপস্থিত ছিলেন। তিনি তাঁর দৌহিত্রের সেই মহান পরীক্ষা স্বয়ং অবলোকন করেছেন। আমাদের নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) জীবিত এবং উম্মতের সব কাজ কর্ম সম্পর্কে অবগত আছেন।

কাহিনী নং ৩৪৩

প্রহসন

১২ই মুহররম ইবনে সাদ আহলে বায়তের অবশিষ্ট সদস্যগণ এবং শহীদগণের মস্তকগুলো নিয়ে কূফার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলো। যখন এরা কূফায় কাছে পৌছলো এবং ইবনে যিয়াদ খবর পেল তখন সে সারা শহরে প্রচার করে দিল যে কেউ যেন হাতিয়ার নিয়ে ঘর থেকে বের না হয় এবং চারিদিকে সৈন্যদের পাহারার ব্যবস্থা করলো, যেন কেউ কোন অঘটন ঘটাতে না পারে। লোকেরা খবর পেয়ে এক নজর দেখার জন্য ঝাঁপিয়ে পড়লো এবং কারবালার কয়েদীগণ এবং শহীদগণের মস্তক দেখে কাঁদতে লাগলো। এ তামাশা দেখে জয়নুল আবেদীন ওদেরকে লক্ষ্য করে বললেন, হে ক্রন্দনকারীগণ দেখতেছি আপনারাতো আমাদের জন্য কাঁদতেছেন। তাহলে ওরা কারা, যারা বাপ-ভাইদেরকে হত্যা করলো?
(তাজকিরা ৯৭ পৃঃ)

সবকঃ সব ক্রন্দনকারী সত্যিকার ক্রন্দনকারী নয়। কোন সময় জালিম স্বীয় জুলুম গোপন করার জন্য মজলুমের সহায়তাকারী হয়ে যায়। এটা হচ্ছে ধোঁকাবাজি।

কাহিনী নং ৩৪৪

খন্ডিত মস্তকের কুরআন তেলাওয়াত

হযরত যায়দ বিন আরকম (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি একজন বিশিষ্ট সাহাবী ছিলেন, তিনি বলেন, যখন কূফার অলিতে গলিতে ইমাম হোসাইনের মস্তক বর্শার অগ্রভাগে উঠায়ে ঘুরানো হচ্ছিল, তখন আমি আমার ঘরের জানালার পাশে বসা ছিলাম। আমার পাশ দিয়ে নিয়ে যাবার সময় আমি সেই খণ্ডিত মস্তককে কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করতে দেখলাম أَمْ حَسِبْتَ أَنَّ أَصْحَابَ الْكَهْفِ وَالرَّقِيمِ كَانُوا مِنْ آيَاتِنَا عَجَبًا (নিশ্চয় আসহাবে কাহাফ ও রকিম আমার নিদর্শন সমূহের মধ্যে এক আজব নির্দশন ছিল।) এ দৃশ্য দেখে আমার শরীরের লোম খাড়া হয়ে গেল এবং আমি আরয করলাম, হে নবীর আওলাদ! আপনার এ ঘটনা সেথেকে আরও অধিক আশ্চর্যকর। এরপর যখন বর্শা থেকে নামায়ে ইবনে জিয়াদের সামনে মস্তক মুবারক রাখা হলো, তখন ইমাম হোসাইনের ঠোঁট মুবারক নড়তেছিল। লোকেরা মুখের কাছে কান লাগিয়ে শুনতে পেল যে তিনি এ আয়াত তেলাওয়াত করছেন فَلَا تَحْسَبَنَّ اللَّهَ غَافِلًا عَمَّا يَعْمَلُ الظَّالِمُونَ (আল্লাহ তাআলাকে জালিমের কাজ কর্মের প্রতি উদাসীন মনে করো না)

(তযাকিরা - ৯৮ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহর পথে জান বিসর্জনকারীগণ মৃত্যুবরণ করেন না। বরং তারা জীবিত থাকেন। শহীদগণের জিন্দেগীর ব্যাপারে কুরআনী প্রমাণ রয়েছে। যেমন আল্লাহ তাআলা ফরমান وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتٌ অর্থাৎ আল্লাহর পথে যারা কতল বা শহীদ হয় ওদেরকে মৃত বলনা। সুতরাং হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) জীবিত এবং জীবিত থাকবেন।

কাহিনী নং ৩৪৫

আযীয বিন হারুন

শহীদ পরিবারের অবশিষ্ট সদস্যগণ ও শহীদগণের মস্তকগুলোকে কয়েকদিন কূফায় রাখার পর ইবনে যিয়াদ ইয়াযিদ বাহিনীর তত্ত্বাবধানে দামেস্কে পাঠিয়ে দিল। দামেস্কে যাবার পথে হওয়ালী হলব নামে এক জায়গায় এসে এক পাহাড়ের

পাদদেশে কাফেলা যাত্রা বিরতি করলো। সেই পাহাড়ের উপর ছিল একটি ছোট শহর। সেই শহরের প্রধানের নাম ছিল আযিয বিন হারুন এবং সে ছিল একজন ইহুদী। রাত্রে হযরত শহর বানুর বাঁদী শীরীন কেঁদে কেঁদে বললো, যদি আপনি অনুমতি দেন, আমার কাছে যা কিছু আছে তা বিক্রি করে এ পাহাড়ী শহর থেকে আপনার জন্য কাপড় ক্রয় করে আনতে পারি। বিবি সাহেবা ওর বার বার বলাতে অনুমতি দিয়ে দিলেন। অনুমতি পেয়ে শীরীন পাহাড়ের উপর উঠলো এবং শহরের দরজা বন্ধ পেয়ে করাঘাত করলো। শহরের প্রধান নিজেই এসে দরজা খুলে দিল এবং শীরীনের নাম ধরে ডাক দিল। শীরীন সালাম করলো। সে ওকে সসম্মানে ওর ঘরে নিয়ে গেল। শীরীন জিজ্ঞেস করলো আপনি আমার নাম কি করে জানলেন? সে বললো, আমি এ মাত্র স্বপ্নে হযরত মুসা ও হারুন আলাইহিস সালামকে পেরেশানী অবস্থায় দেখে এর কারণ জিজ্ঞেস করলাম। তাঁরা বললেন, 'তুমি বোধ হয় জান না যে শেষ যুগের নবী মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দৌহিত্রকে নির্মমভাবে হত্যা করা হয়েছে। ওনার খণ্ডিত মস্তক সিরিয়ায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। আমি ওনাদেরকে জিজ্ঞেস করলাম, আপনারা কি মুহাম্মদ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে চিনেন এবং মানেন? তাঁরা বললেন, হে আযিয! তিনি সত্যিকার রসূল। তাঁর সম্পর্কে আল্লাহ তায়ালা আমাদের থেকে ওয়াদা নিয়েছেন। আমরা ওনার উপর ঈমান এনেছি। যে ওনার উপর ঈমান আনবে না, সে দোযখে যাবে'। আমি আরয করলাম, আমার আস্থা বৃদ্ধির জন্য কিছু বলুন। বললেন, 'কিল্লার গেইটের কাছে গিয়ে দাঁড়াও। শীরীন নামে এক বাঁদী এসে গেইটে ধাক্কা দেবে। তুমি ওর সাথে যেও, এর ফলে ইসালাম ধর্ম গ্রহণের সৌভাগ্য লাভ করবে এবং যখন তুমি হোসাইনের মস্তকের কাছে পৌছবে আমাদের সালাম বলিও। সে সালামের জবাব দিবে'। এ স্বপ্ন দেখার পর ঘুম ভাঙ্গার সাথে সাথে যে মাত্র গেইটের কাছে এসে দাঁড়িয়েছি, তুমি তখনই গেইটে ধাক্কা দিয়েছ। শীরীন বিবি সাহাবার কাছে এসে সম্পূর্ণ কাহিনী বর্ণনা করলো। এ কাহিনী শুনে আহলে বায়তের সবাই খুবই আশ্চর্যান্বিত হলেন। সকালে আযিয বিন হারুন ইয়াযিদ বাহিনীকে কিছু ঘুষ দিয়ে আহলে বায়তের কাছে আসলো এবং প্রত্যেকের জন্য মূল্যবান কাপড় আনলো এবং ইমাম জয়নুল আবেদীনের সামনে এক হাজার দিনার নজরানা পেশ করে মুসলমান হয়ে গেল। অতঃপর ইমাম হোসাইনের মস্তক মুবারকের সামনে গিয়ে হযরত মূসা ও হারুন আলাইহিস সালামের সালামের সালাম পেশ করলে

মস্তক মুবারক সালামের জবাব দেন। (তাজকিরা ১০২ পৃঃ)

সবক ঃ হযরত ইমাম হোসাইনের বেছালের পরও ফয়েজ জারী ছিল। এ ফয়েজের বরকতে এক ইহুদী ইসলাম গ্রহণ করে বাধ্য হন। আল্লাহ ওয়ালাগণ দুনিয়া থেকে চলে গেলেও ওনাদের ফয়েজ বরকত যথারীতি জারী থাকে।

কাহিনী নং ৩৪৬

গির্জার পাদরী

ইয়াযিদী বাহিনী কারবালার কয়েদী ও শহীদগণের মস্তক নিয়ে দামেস্কে যাবার পথে রাতে এমন এক জায়গায় গিয়ে পৌঁছলো যেখানে একটা বড় মজবুত গির্জা দেখতে পেল। ইয়াজিদ বাহিনী রাত্রে সে গির্জায় অবস্থান করাটা সমীচীন মনে করলো। একজন বৃদ্ধ পাদরী সেই গির্জায় থাকতো। সীমার পাদরীর কাছে গিয়ে গির্জায় রাত্রি যাপনের অনুমতি চাইলো। পাদরী জিজ্ঞেস করলো, তোমরা কে এবং কোথায় যাচ্ছ? সীমার বললো, আমরা ইবনে যিয়াদের সৈন্য, আমরা একজন বিদ্রোহীর খণ্ডিত মস্তক তার সহযোগী ও পরিবার পরিজনকে দামেস্কে নিয়ে যাচ্ছি। পাদরী জিজ্ঞেস করলো, তুমি যে বিদ্রোহীর মস্তক নিয়ে যাবার কথা বলছ, সেই মস্তকটা কোথায়? সীমার মস্তকটা ওকে দেখালো। পাদরী মস্তক দেখে শিহরিয়ে উঠলো এবং বললো, তোমাদের সাথেতো অনেক লোক। গির্জায় এত লোকের স্থান হবে না। তুমি এক কাজ করতে পার। কয়েদী ও মস্তকগুলো গির্জায় রেখ এবং তোমরা বাইরে অবস্থান কর। সীমার পাদরীর প্রস্তাবটা ভাল মনে করলো। কারণ এতে মস্তক ও কয়েদী নিরাপত্তায় থাকবে। অতএব ইমামের মস্তককে একটি সিন্ধুকে বন্ধ করে একটি কুঠরীতে রাখা হলো এবং আহলে বায়তের সদস্যদেরকে অন্য একটি কামরায় স্থান দেয়া হলো। অর্ধরাত্রিতে পাদরী মস্তক রক্ষিত কুঠরীতে আলো দেখতে পেল। উঠে ভালমতে দেখলো যে কুঠরীর চারিদিক আলোকিত। কিছুক্ষণ পর দেখতে পেল যে কুঠরীর ছাদ উন্মুক্ত এবং হযরত খাদীজা ও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর অন্যান্য স্ত্রীগণ তথায় উপস্থিত এবং তাঁরা সিন্দুক খুলে মস্তক মুবারক দেখতেছেন। এর কিছুক্ষণ পর এ আওয়াজটি কানে আসলো, হে বৃদ্ধ পাদরী, উঁকি দেয়া বন্ধ কর, খাতুনে জান্নাত তশরীফ আনতেছেন। পাদরী এ আওয়াজ শুনে বেহুশ হয়ে গেল। যখন হুশ

আসলো তখন চোখের সামনে পর্দা দেখতে পেল। তবে শুনতে পেল যে কেউ কেঁদে কেঁদে এ রকম বলছেন-

"তোমার উপর সালাম হে মজলুম জননী, হে শহীদ জননী। দুঃখ করনা আমি দুশমনদের থেকে এর প্রতিশোধ নেবো এবং আল্লাহর কাছে এর প্রতিকার চাইবো।"

পাদরী পুনরায় বেহুশ হয়ে গেল। যখন হুশ ফিরে এলো তখন কিছু দেখলো না। সীমাহীন অস্থির হয়ে কুঠরীর তালা ভেঙ্গে ভিতরে প্রবেশ করলো। সিন্ধুকের তালা ভেঙ্গে মস্তক মুবারক বের করে মেশক ও গোলাপ জল দ্বারা ধৌত করে জায় নামাযের উপর রাখলো এবং এর সামনে বিনীতভাবে দাঁড়িয়ে আরয করলো, হে সরদার,আমার জানা হয়ে গেছে যে আপনি ঐ সব মহান লোকদের অন্তর্ভুক্ত যাদের মর্যাদার কথা আমি তৌরিত ও ইঞ্জিলে পড়েছি। আপনি সাক্ষী থাকুন, আমি মুসলমান হয়ে যাচ্ছি। অতঃপর সেখানেই কলেমা পড়ে মুসলমান হয়ে গেল। (তাজকিরা ১০৫)

সবকঃ আল্লাহর পথে শাহাদত বরণকারীগণ চির অমর। এ সব আল্লাহ ওয়ালাগণ বাহ্যিকভাবে দুনিয়া থেকে তশরীফ নিয়ে গেলেও ওনাদের কাজ যথারীতি চালু থাকে। হযরত ইমাম হোসাইন বেসালের পরও খৃষ্টানদেরকে মুসলমান করেছেন। আফসোসের বিষয় আজকাল ইমাম হোসাইনের প্রতি ভক্তির দাবীদার অনেকেই নিজেদের চাল চালন ও বেশভূষায় খৃষ্টানদের অনুকরণ করছে।

কাহিনী নং ৩৪৭

ঢোল বাদ্য

ইয়াযিদ যখন জানতে পারল যে কারবালার কয়েদী ও শহীদগণের মস্তক নিয়ে ইয়াযিদী বাহিনী দামেস্কের কাছাকাছি এসেছে, তখন সে সমগ্র শহরকে সজ্জিত করতে, শাহরবাসীকে আনন্দ প্রকাশ করতে এবং এ অপূর্ব দৃশ্য দেখার জন্য সবাইকে ঘর থেকে বের হয়ে আসার নির্দেশ দিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর সাহাবী হযরত সাহাল (রাদি আল্লাহু আনহু) সেই সময় ব্যবসা উপলক্ষে সিরিয়া গিয়েছিলেন। তিনি তখন দামেস্কের কাছে এক ছোট শহরে যাবার সময় সেখানকার লোকদেরকে ঢোল বাদ্য বাজিয়ে আনন্দ প্রকাশ করতে দেখে

এক ব্যক্তিকে এ আনন্দের হেতু জিজ্ঞেস করলেন। লোকেরা ওনাকে জানালো যে ইরাকবাসী ইয়াযিদের কাছে হোসাইনের মস্তক হাদিয়া হিসেবে পাঠিয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে সেটা নিয়ে ইয়াযিদী সেনা শহরে প্রবেশ করবে। সেটার জন্য সিরিয়াবাসী আনন্দ প্রকাশ করছে। হযরত সাহাল (রাদি আল্লাহু আনহু) একটি দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলে জিজ্ঞেস করলেন, হোসাইনের মস্তক কোন প্রবেশদ্বার দিয়ে আনা হচ্ছে? বললো, বাবুস সায়্যাত দিয়ে। তিনি সে দিকে দৌড়ে গেলেন এবং অনেক কষ্ট করে আহলে বায়তের কাছাকাছি গেলেন। তিনি দেখলেন যে ইমাম হোসাইনের মস্তক একটি তীরে বিদ্ধ করে উচিয়ে ধরেছে। সেটা দেখে তিনি অপ্রত্যাশিতভাবে কেঁদে দিলেন। আহলে বায়তের একজন জিজ্ঞেস করলেন, আপনি আমাদের জন্য কেন কাঁদতেছেন? তিনি জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নাম কি? বললেন, আমার নাম সকিনা বিনতে হোসাইন। তিনি বললেন, আমি আপনার বড় নানার সাহাবী। কিছু বলার থাকলে আমাকে বলুন। যথাসাধ্য চেষ্টা করব। হযরত সকিনা বললেন, আমার আব্বার মস্তকটা একেবারে সামনে নিয়ে যাবার ব্যবস্থা করতে পারেন কিনা একটু চেষ্টা করে দেখুন, যাতে লোকেরা ঐদিকে ধাবিত হয় এবং আমাদের থেকে দূরে থাকে। তিনি ইয়াযিদী বাহিনীকে চারশ দেরহাম দিয়ে ইমামের মস্তক মহিলাদের থেকে দূরে সরায়ে দিলেন।

(তাজকিরা ১০৭ পৃঃ)

সবকঃ এ কাহিনী থেকে বুঝা গেল যে ঢোল বাদ্য বাজিয়ে মুহররম উদযাপন করা ইয়াযিদী সুন্নাত।

কাহিনী নং ৩৪৮

বে আদব

কারবালার কয়েদীগণ ও শহীদগণের মস্তকগুলো নিয়ে ইয়াযিদী বাহিনী যখন দামেস্কে প্রবেশ করলো, তখন ইয়াযিদ তার দরবারকে সজ্জিত করলো এবং শহরের গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে দাওয়াত দিল। কায়েদীগণকে দরবারের একদিকে বসালো এবং মস্তকগুলো ওর সামনে নিয়ে গিয়ে একটি একটি করে দেখলো এবং এ পরিণতির প্রেক্ষাপট জানতে চাইলো। সবের কাহিনী শুনে দীর্ঘক্ষণ মাথা নীচু করে রইলো। পুনরায় নির্দেশ দিল যে ইমামের মস্তক একটি রেকাবে রেখে যেন ওর সামনে আনা হয়। নির্দেশমত ইমামের মস্তক রেকাবে রেখে ওর সামনে রাখা

হলো। সে তার হাতের লাঠি ইমামের ঠোঁট ও দাঁতে লাগিয়ে বললো, এইটা কি হোসাইনের ঠোঁট ও দাঁত? এ দৃশ্য দেখে হুযূরের এক সাহাবী ইবনে জুনদব (রাদি আল্লাহু আনহু) যিনি সেখানে উপস্থিত ছিলেন, হঠাৎ বলে উঠলেন قَطَعَ اللّٰهُ يَدَكَ يَايَزِيْدُ আল্লাহ তোমার হাতকে ধ্বংস করবে। তুমি লাঠি দ্বারা এমন জায়গায় গুতা দিচ্ছ, যেখানে আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)কে অনেকবার চুমু দিতে দেখেছি। ইয়াযিদ এ কথা বলায় ওনাকে দরবার থেকে বের করে দিল।

(তাজকিরা ১১০ পৃঃ)

সবকঃ ইয়াযিদ বড় বেআদব ফাসিক ও ফাজির ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর আহলে বায়তের প্রতি ওর কোন দুর্বলতা ছিল না।

কাহিনী নং ৩৪৯

মায়াকান্না

যে সময় আহলে বায়তের অবশিষ্ট সদস্যগণ ও শহীদগণের মস্তকগুলোকে ইয়াযিদের দরবারে আনা হলো. তখন ইয়াযিদের স্ত্রী হিন্দা অস্থির হয়ে বেপর্দা অবস্থায় দরবার কক্ষে চলে আসলো। ইয়াযিদ দৌড়ে গিয়ে ওর মাথায় কাপড় দিল এবং বললো, ওহে হিন্দা, আমি বুঝতে পেরেছি তুমি আহলে বায়তের জন্য খুবই শোকার্ত। অভিশপ্ত ইবনে যিয়াদ এ ব্যাপারে খুবই বাড়াবাড়ি করেছে অথচ আমি ওনাদের হত্যার ব্যাপারে মোটেই রাজি ছিলাম না।

(ফয়সালায়ে শরয়ীয়া ৫০ পৃঃ)

সবকঃ ইয়াযিদ ও ওর পরিবারের এসব আচরণ ছিল সম্পূর্ণ কৃত্রিম। ইয়াযিদের ইঙ্গিতেই হত্যাকাণ্ড ঘটে ছিল।

কাহিনী নং ৩৫০

খোদার জয়গান

কারবালার কয়েদীগণকে যখন ইয়াযিদের দরবারে আনা হয়, তখন ইয়াযিদ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনকে দেখে জিজ্ঞেস করলো, এ কে? তাকে জানানো হলো যে, এ আলী বিন হোসাইন। ইয়াযিদ বললো, আমিতো শুনেছিলাম সে মারা

গেছে। তাকে বলা হলো যে ইমাম হোসাইনের তিন ছেলে ছিল। এর মধ্যে আলী আকবর ও আলী আসগর মারা গেছে। এ হচ্ছে আলী আউসাত, অসুখের কারণে বেঁচে গেছে এবং গ্রেপ্তার করে নিয়ে আসা হয়েছে। ইয়াযিদ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীনকে ডেকে ওর ছেলের কাছে বসালো এবং বললো, হে আলী, আমার ছেলে তোমার সমবয়সী। তুমি কি ওর সাথে মুকাবিলা করতে পারবে? তিনি বললেন, দু'জনের হাতে দু'টি তলোয়ার দিন এবং মুকাবিলা করায়ে দেখুন। এরই মধ্যে ইয়াযিদের ডঙ্কা বেজে উঠলো। ইয়াযিদের ছেলে খুবই গর্বভরে বললো, এযে জয়ডঙ্কা বাজতেছে, সেটা আমার বাপের নামে বাজতেছে, নাকি তোমার বাপের নামে? ইমাম জয়নুল আবেদীন উত্তর দেয়ার ব্যাপারে একটু চিন্তা করলেন। ইত্যবসরে মসজিদ থেকে আজানের ধ্বনি ভেসে আসলো। ইমাম জয়নুল আবেদীন আর দেরী না করে ইয়াযিদের ছেলেকে বললেন, মনযোগ সহকারে শুন, আমার বাপ দাদার জয়ডঙ্কা বাজতেছে, যেটা কিয়ামত পর্যন্ত বাজতে থাকবে। তোমার বাপের ডঙ্কাতো কিছুদিন পর বন্ধ হয়ে যাবে। ইয়াযিদের ছেলে এর কোন উত্তর দিতে পারলো না। উপস্থিত সবাই ইমাম জয়নুল আবেদীনের বাগ্মিতা দেখে আশ্চর্য হয়ে গেল।

(তাজকিরা ১১৪ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম হোসাইন ও আহলে বায়তের প্রতি শ্রদ্ধাবোধ কিয়ামত পর্যন্ত জারী থাকবে কিন্তু ইয়াযিদের নাম নিতেও কেউ রাজী নয়। জুলুম জালিমকে বিলুপ্ত করে এবং সবর সবরকারীকে আল্লাহর মকবুল বান্দা বানিয়ে দেয়।

কাহিনী নং ৩৫১

দামেস্কের জামে মসজিদে

ইয়াযিদের দরবারে ইমাম জয়নুল আবেদীনকে আনার পর এক পর্য্যায়ে ইয়াযিদ ওনাকে বললো, হে ইবনে হোসাইন, তোমার কিছু কাম্য থাকলে আমাকে বলতে পার। হযরত জয়নুল আবেদীন বললেন, আমার আব্বার হত্যাকারীকে আমার কাছে সোপর্দ করা হোক, যেন আমি নিজ হাতে ওকে হত্যা করতে পারি। ইয়াযিদ সেটা অস্বীকার করলো। ইমাম পুনরায় বললেন, আমার আব্বার মস্তক মুবারক আমার কাছে হস্তান্তর করা হোক যেন আমি বিচ্ছিন্ন শরীরের সাথে সংযুক্ত করে দাফন করতে পারি। ইয়াযিদ বললো, এতে রাজি আছি। আর কিছু বলার

আছে? বললেন, আমাকে অনুমতি দেয়া হোক যেন আমি আহলে বায়তের অবশিষ্ট সদস্যদেরকে নিয়ে মদীনা শরীফে চলে যেতে পারি। ইয়াযিদ বললো এতেও সম্মতি দিলাম। আর কিছু বলার আছে? বললেন, কাল জুমাবার আমাকে মিম্বরে গিয়ে খোতবা দেয়ার অনুমতি দেয়া হোক। ইয়াযিদ বললো, তোমার এ আশাও পূর্ণ করা হবে। কাল তোমাকে দিয়ে খোতবা পড়াবো। পর দিন দামেস্কের জামে মসজিদে ইয়াযিদ ইমাম জয়নুল আবেদীনকে খোতবা পড়ার অনুমতি দিয়া দিল। মসজিদে এত ব্যাপক লোকের সমাগম হয়েছিল যে অনেকে মসজিদে বসার জায়গা পায়নি।

হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন মিম্বরে আরোহণ করে প্রথমে একান্ত সুন্দর এ সাবলীল ভাষায় হামদ ও নাত বর্ণনা করলেন। অতঃপর বললেন, আপনাদের মধ্যে অনেকে আমাকে চিনেন। যারা চিনেন না, এখন জেনে নিন, আমি হলাম হযরত মুহাম্মদ রসূলুল্লাহ (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর বংশের আলো, শেরে খোদা হযরত আলী ও ফাতেমা যুহরার নয়নমনি এবং হযরত হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সন্তান, যাকে কারবালা ময়দানে তিন দিন ভুখা ও তৃষ্ণার্ত রেখে নির্মমভাবে শহীদ করা হয়েছে। এ কথা শুনে মসজিদে ক্রন্দনের রোল পড়ে গেল। মুসল্লীদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি হয়ে গেল। ইয়াযিদ অবস্থাদৃষ্টে ভীত হয়ে মুয়াজ্জিনকে তাড়াতাড়ি ইকামত দিতে ইশারা করলো। মুয়াজ্জিন যখন 'আল্লাহু আকবর' বললো তিনি বললেন نَعَمْ لَا شَيْئَ اَكْبَرُ مِنْهُ (ঠিকই তাঁর থেকে বড় কোন কিছু নেই।) মুয়াজ্জিন যখন 'আশহাদু আন লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু'বললো, তখন তিনি বললেন نَعَمْ شَهِدَ بِهَا لَحْمِيْ وَشَعْرِيْ وَدَمِيْ (হ্যাঁ, আমার রক্ত মাংস সেটার সাক্ষ্য দিচ্ছে।) মুয়াজ্জিন যখন 'আশাহাদু আন্না মুহাম্মাদান রাসূলুল্লাহ' বললো, তিনি স্বীয় পাগড়ী খুলে মুয়াজ্জিনের দিকে নিক্ষেপ করলেন এবং বললেন, মুহাম্মদের দোহাই, একটু বন্ধ কর। মুয়াজ্জিন চুপ হয়ে গেল। ইমাম আবেদীন বললেন, হে ইয়াযিদ, মুয়াজ্জিন যে মুহাম্মদের নাম নিল এ মুহাম্মদ কি তোমার দাদা, না আমার। যদি তুমি ওনাকে তোমার দাদা বল, তাহলে সমগ্র বিশ্বসাসী তোমাকে মিথ্যুক বলবে আর যদি আমার পরদাদা বলে স্বীকার করে থাক, তাহলে আমার আব্বাকে কেন নিষ্ঠুর ভাবে শহীদ করলে, আমাকে কেন ইয়াতীম বানালে? আহলে বায়তকে কেন শহরময় ঘুরালে এবং বন্দী করে তোমার দরবারে আনালে, কেন

আমার বাপ দাদার ধর্মে কলংক লেপন করলে? এত কিছুর পরও লজ্জা হয় না, মুসলমান বলে দাবী করতে? অতঃপর মুসল্লীদেরকে সম্বোধন করে বললেন, তোমাদের মধ্যে কি এমন কেউ আছে, যাঁর দাদা পয়গাম্বর? ঐ সময় মসজিদে এমন অবস্থা সৃষ্টি হলো যে লোকেরা অঝোরে কাঁদতে লাগলো, অনেকেই বেহুশ হয়ে পড়ে গেল। অবস্থা বেগতিক দেখে ইয়াযিদ মুয়াজ্জিনকে বকা দিয়ে ইকামত পুরা করালো এবং জুমার নামাজ আদায় করলো। জনগণের ভারাক্রান্ত মনকে হালকা করার জন্য ইয়াযিদ এক জনসভার আয়োজন করলো। উক্ত সভায় ইয়াযিদ প্রকাশ্যে কূফার সরদারদের তিরস্কার করলো, গালাগালি করলো, ওদের এ জঘন্য আচরণের জন্য ক্ষোভ প্রকাশ করলো। সে আরও বললো হোসাইনকে আমার কাছে জীবিত আনলে আমি খুবই খুশী হতাম। ইবনে যিয়াদের উপর খোদার লানত, সেই এ কাজটি করেছে।
(তাজকিরা ১১৫ পৃঃ)

সবকঃ ইয়াযিদ বড় চালাক ও ধোঁকাবাজ। সে নিজেই সব কিছু করায়ে অন্যদেরকে দোষারোপ করছে এবং নিজেকে নির্দোষ বলে প্রকাশ করছে।

কাহিনী নং ৩৫২

মদীনায় প্রত্যাবর্তন

ইয়াযিদ আহলে বায়তের সদস্যগণকে শহীদগণের মস্তকগুলো সহ হযরত নোমান বিন বশীর (রাদি আল্লাহু আনহু) এর সাথে মদীনা মনোয়ারায় ফিরে যেতে অনুমতি দিয়ে দিল। হযরত নোমান বিন বশীর একান্ত আদব ও তাজীমের সাথে আহলে বায়তের সদস্যগণকে মদীনায় নিয়ে গেলেন। হযরত নোমান বিন বশীরের এ খেদমতে আহলে বায়তের সদস্যগণ খুব সন্তুষ্ট হলেন এবং ওনাকে দুআ করলেন। মদীনা বাসীগণ যখন জানতে পারলেন যে আহলে বায়তের অবশিষ্ট সদস্যগণ ফিরে আসতেছেন, তখন ছোট বড় সবাই অস্থির হয়ে ক্রন্দনরত অবস্থায় ওনাদেরকে গ্রহণ করার জন্য অনেক দূর এগিয়ে গেল। আহলে বায়তের সদস্যগণ মদীনা শরীফ পৌঁছে প্রথমে রাওজা মোবারকে উপস্থিত হয়ে ব্যথাতুর কণ্ঠে আরয করলেন, ইয়া রাসূলাল্লাহ! আমরা ইয়াতীম ও মজলুম হয়ে ফিরে এসে আপনার দরবারে হাজির হলাম। ইয়া রাসূলাল্লাহ, আমাদের অবস্থা দেখুন। দুশমনদের হাতে কিভাবে নিপীড়িত হয়েছি, তা অবলোকন করুন। যে মসীবত আমাদের উপর

গেছে সেটার কি আর বর্ণনা দেব। এ ধরনের ঘটনা দুনিয়ার বুকে আর কখনো ঘটেনি, ঘটবে না।

আহলে বায়তের সদস্যগণ এভাবে কেঁদে কেঁদে তাঁদের প্রিয় নানাজানের কাছে ঘটনা আরয করছিলেন। উম্মুল মুমেনীন হযরত উম্মে সালমা (রাদি আল্লাহু আনহা) হযরত ইমাম হোসাইনের ছোট মেয়েটির হাত ধরে তথায় উপস্থিত হলেন। তাঁর হাতে ছিল একটি শিশি যেটায় মাটি ভর্তি ছিল। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ওনাকে এ মাটিগুলো দিয়ে বলেছিলেন, যেদিন আমার হোসাইন শহীদ হবে সেদিন এ মাটি রক্ত হয়ে যাবে। ঠিকই তখন মাটিগুলো রক্ত হয়ে গিয়েছিল। আহলে বায়তের সদস্যগণ ওনার হাতে সেই রক্ত ভর্তি শিশি দেখে আরও অস্থির হয়ে গেলেন। মোট কথা সেই সময় কিয়ামতের দৃশ্য ফুটে উঠেছিল, সমগ্র মদীনাবাসী শোকে মুহ্যমান হয়ে পড়েছিল, ছোট বড় সবাই অশ্রুসিক্ত হয়েছিল।
(তাজকিরা ১১৬ পৃঃ)

সবকঃ কারবালার ঘটনা বড়ই মর্মান্তিক। প্রতিটি মুসলমানের মনে এ ঘটনা দারুণ রেখাপাত করে। এতে মুসলমানদের জন্য অনেক শিক্ষনীয় বিষয় রয়েছে। মুসলমানগণের উচিৎ যে আহলে বায়তের পদাঙ্ক অনুসরণ করে সৎ ও ন্যায়ের ঝান্ডা সমুন্নত রাখার খাতিরে নিজেদের মধ্যে সব রকমের ত্যাগের জজবা সৃষ্টি করা এবং সেই শরীয়ত বিরোধী কাজ ও বিদআত থেকে বিরত থাকা, যেগুলোর ব্যাপারে আহলে বায়তের সদস্যগণ শেষ নিশ্বাস ত্যাগের আগ পর্যন্ত নিষেধ করে গেছেন।

কাহিনী নং ৩৫৩

হযরত জয়নুল আবেদীন

হযরত ইমাম হোসাইন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মধ্যম ছেলের নাম আলী আউসাত ছিল। কিন্তু অধিক ইবাদতের কারণে তাঁর নাম জয়নুল আবেদীন হিসেবে প্রসিদ্ধি লাভ করে। তিনি প্রতিদিন এক হাজার রাকাত নফল নামায পড়তেন। একদিন তিনি ঘরে নামায পড়ছিলেন, এমন সময় তাঁর ঘরে আগুন লেগেছিল। লোকেরা এসে আগুন নিভাতে লাগলো কিন্তু তিনি একাগ্রচিত্তে নামায রত ছিলেন। যখন আগুন নিভে গেল এবং তিনিও নামায থেকে ফারেগ হলেন, তখন লোকেরা

আরয করলেন, হুযূর ঘরেতো আগুন লেগেছিল। আমরা আগুন নিভাতে ব্যস্ত রইলাম কিন্তু আপনি তো ভ্রুপেক্ষও করলেন না। তিনি ফরমালেন, তোমরাতো এ দুনিয়াবী আগুন নিভাতে ছিলে আর আমি আখেরাতের আগুন নিভাতে ব্যস্ত ছিলাম।
(রাউজুর রিয়াহীন ৫৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন জান্নাতী হওয়া সত্ত্বেও এ রকম ইবাদত করতেন এবং পরকালের আগুন নিভাতে ব্যস্ত থাকতেন। কিন্তু আমরা নিয়মিত পাঁচ ওয়াক্ত নামায আদায় করে জাহান্নামের আগুন থেকে বাঁচার জন্য আদৌ সচেষ্ট নই। এটা আমাদের বড় অবহেলা।

কাহিনী নং ৩৫৪

সহনশীলতা

একদিন হযরত ইমাম জয়নুল আবেদীন ঘর থেকে বের হলেন। রাস্তায় এক বেআদব তাঁকে যা তা বলতে লাগলো। তিনি ওকে বললেন, ভাই তুমি যা বলতেছ, সত্যিই যদি আমি সে রকম হয়ে থাকি, আমি আল্লাহর কাছে ক্ষমা চাই। আল্লাহ যেন আমাকে মাফ করেন। লোকটি তাঁর এ কথা শুনে খুবই লজ্জিত হলো এবং এগিয়ে এসে তাঁর কপালে চুমু দিয়ে বললো, হুযূর আমি যা বলেছি সে রকম আপনি কখনো নন। আমি নিজেই মিথ্যুক। আপনি আমার মাগফিরাতের জন্য দুআ করুন। তিনি বললেন, ঠিক আছে, তুমি যাও। আল্লাহ তোমাকে মাফ করুক।

(রাউজুর রিয়াহীন ৫৬ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণের এটাই স্বভাব যে অন্যায়কারীদের সাথে এমনভাবে আচরণ করেন যে অন্যায়কারী স্বীয় আচরণের ব্যাপারে লজ্জিত হয়ে অন্যায় কাজ থেকে বিরত হয়ে সৎকাজের প্রতি ধাবিত হয়।

কাহিনী নং ৩৩৫

মারাত্মক অজগর সাপ

খলীফা মনসুর একদিন তার উজীরকে বললো, ইমাম জাফর সাদেককে ডেকে নিয়ে এসো, আমি ওকে হত্যা করে ফেলবো। উজীর বললো, একজন নিজ নবাসী সৈয়দকে হত্যা করা সমীচীন নয়। খলীফা ওর উপর অসন্তুষ্ট হয়ে বললো

আমি যা নির্দেশ দিচ্ছি, সেটা পালন কর। অনন্যোপায় হয়ে উজীর হযরত ইমাম জাফর সাদেককে ডাকতে গেল এবং এদিকে খলিফা মনসুর গোলামদেরকে নির্দেশ দিয়ে রাখলো যে যখন জাফর সাদেক আসবে আমি আমার তাজ মাথা থেকে নামিয়ে রাখবো, তখন তোমরা ওকে হত্যা করে ফেলিও। যথাসময়ে ইমাম জাফর সাদেক তশরীফ আনলেন এবং দরবারে প্রবেশ করলেন। মনসুর তাঁকে দেখে অভ্যর্থনার জন্য দৌঁড়ে গেলেন এবং ওনাকে প্রধান আসনে বসায়ে নিজে ওনার সামনে একান্ত আদব সহকারে বসে গেল। গোলামরা বড় আশ্চর্য হয়ে গেল। কারণ প্রোগ্রাম যেটা ছিল এখন হচ্ছে সেটার বিপরীত। মনসুর ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু)কে বললো, আপনার কোন হাজত থাকলে বলতে পারেন। তিনি বললেন, তোমার কাছে আমার এটাই হাজত যে আগামীতে আমাকে যেন ডাকা না হয়, যাতে আমি আল্লাহর ইবাদতে মশগুল থাকতে পারি। মনসুর এতে সম্মতি জ্ঞাপন করলো এবং তাঁকে বড় সম্মানে বিদায় করলো। ঐ সময় মনসুরের সমস্ত শরীর কাঁপছিল। ইমাম জাফর সাদেক চলে যাওয়ার পর উজীর এ অবস্থার কারণ জিজ্ঞেস করলে মনসুর বললো। যখন জাফর সাদেক দরজা দিয়ে দরবারে প্রবেশ করলেন, তখন আমি তাঁর সাথে একটি মারাত্মক অজগর সাপ দেখতে পেলাম, যার এক চোয়াল আমার আসনের উপর এবং অপর চোয়াল আসনের নিচে ছিল এবং সুস্পষ্ট ভাষায় বলছিল, তুমি যদি ইমামকে কষ্ট দাও, আমি আসনসহ তোমাকে গিলে ফেলবো। তাই আমি অজগরের ভয়ে এ সব কিছু করলাম, যা তোমরা দেখেছ।
(তাজকিরাতুল আউলীয়া ১৫ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণকে কষ্ট দেয়ার পরিণতি খুবই মারাত্মক হয়ে থাকে। তাই এ ব্যাপারে সতর্ক থাকা উচিত।

কাহিনী নং ৩৫৬

মূল্যবান পোষাক

হযরত ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) কে একদিন লোকেরা দেখলো যে তিনি অধিক মূল্যবান কাপড় পরিধান করে আছেন। এক ব্যক্তি তাঁকে বললো, ওহে নবীর আওলাদ, এত মূল্যবান কাপড় আহলে বায়তের জন্য শোভা পায় না। তিনি ওর হাত ধরে আস্তিনের ভিতর টেনে নিয়ে বললেন, দেখ এটা কি?

সে দেখলো যে তিনি ভিতরে চটের মত অমসৃন কাপড় পরিধান করেছেন। তিনি বললেন, এটা খালেকের জন্য আর সেটা মখলুকের জন্য।
(তাজকিরাতুল আউলীয়া ১৭ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের সম্পর্কে বাহ্যিক পোষাক আশাক দেখে খারাপ ধারণা করা উচিত নয়। তাঁদের মন সদা দুনিয়ার মহব্বত থেকে একেবারে খালি থাকে।

কাহিনী নং ৩৫৭

দিনারের থলি

এক ব্যক্তির দিনারের থলি হারিয়ে গিয়েছিল। সে ইমাম জাফর (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ধরে বললো, আমার থলি আপনিই নিয়েছেন। ইমাম জাফর বললেন, আপনার থলিতে কত দিনার ছিল? সে বললো, এক হাজার দিনার। তিনি ওকে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং এক হাজার দিনার দিয়ে দিলেন। পরের দিন লোকটি সেই হারানো থলিটি পেয়ে গেল। সে ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে আসলো এবং ক্ষমা প্রার্থনা করে দিনারগুলো ফেরত দিলেন। তিনি ফেরত নিলেন না এবং বললেন, এ দিনার তোমার হয়ে গেছে। আমি প্রদত্ত জিনিস ফেরত লইনা। পরে লোকদের কাছে জিজ্ঞেস করে যখন জানতে পারলো যে ইনি ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) তখন লোকটি খুবই লজ্জিত হলো।
(তাজকিরাতুল আউলীয়া ১৭ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগণ দুনিয়াকে একেবারে নগন্য মনে করেন। তাঁরা দুনিয়ার প্রতি কোন আকর্ষণ পোষণ করেন না। অথচ আমরা ধর্ম কর্ম বাদ দিয়ে দুনিয়ার পিছনে ধাবিত।

কাহিনী নং ৩৫৮

হারুনুর রশীদ ও এক বেদুইন

একবার বাদশাহ হারুনুর রশীদ মক্কা শরীফে আসলে সাধারণ লোকদেরকে তওয়াফ করা থেকে বিরত রাখা হয়, যেন সে একাকী তওয়াফ করতে পারে। যখন সে তওয়াফ করতেছিল, তখন হঠাৎ এক বেদুইন এসে ওর সাথে তওয়াফ

করতে লাগলো। বাদশাহের কাছে এটা খারাপ লাগলো এবং স্বীয় দেহরক্ষীর দিকে তাকালো। দেহরক্ষী বাদশাহের মনোভাব বুঝতে পেরে বেদুঈন লোকটিকে গিয়ে বললো, তুমি সরে যাও, যেন বাদশাহ একাকী তাওয়াফ করতে পারেন। বেদুইন লোকটি বললো, আল্লাহর কাছে এ জায়গায় ছোট-বড়, নিকৃষ্ট-উৎকৃষ্ট, আমীর-ফকীর, রাজা-প্রজা সব বরাবর। এখানে বড় ছোট কোন ভেদাভেদ নেই, তুমি যাও, আমি সরে যাব না। বাদশাহ হারুনুর রশীদ ওর এ জবাব শুনে দেহরক্ষীকে বললো, যাক ওকে থাকতে দাও। উভয়ে তওয়াফ করতে লাগলো। হারুনুর রশীদ যখন হাজর আসওয়াদ চুমু দিতে গেলেন তখন সে ওনাকে ডিঙ্গিয়ে ওনার আগেই হাজর আসওয়াদ চুমু দিয়া দিল। বাদশাহ যখন নামায পড়ার জন্য মকামে ইব্রাহীমের দিকে ধাবিত হলেন. সে ওনাকে অতিক্রম করে আগে গিয়ে নামায আরম্ভ করে দিল। বাদশাহ হারুনুর রশীদ তওয়াফ ও নামায থেকে ফারেগ হয়ে দেহরক্ষীকে বললেন, বেদুইন লোকটিকে আমার কাছে ডেকে আন। দেহরক্ষী গিয়ে যখন বললো, আপনাকে বাদশাহ ডাকছেন, তখন সে বললো বাদশাহের কাছে আমার কোন প্রয়োজন নেই। তাই আমি অনর্থক কেন যাব। তবে ওনার কোন প্রয়োজন থাকলে আমার কাছে আসতে পারে। দেহরক্ষী এ জবাব শুনে রাগান্বিত হয়ে ফিরে গেল এবং সে যা বলেছে, তা বাদশাহকে বললো। বাদশাহ তা শুনে বললেন, সে ঠিকই বলেছে। আমাকে ওর কাছে যাওয়া উচিত। অতঃপর বাদশাহ নিজেই সেই বেদুইনের কাছে গেলেন এবং ওর সামনে দাড়িয়ে 'আস্সালামু আলাইকুম' বললেন। বেদুইন লোকটি 'ওয়া আলাইকুমুস সালাম' বলে জবাব দিল। বাদশাহ বললেন, ভাই বসতে পারি? বেদুইন জবাব দিল, এ ঘর আপনারও না, আমারও না। আমি অনুমতি দেয়ার কে? এখানে সবাই বরাবর। আপনি ইচ্ছে করলে বসতে পারেন অথবা চলে যেতে পারেন। হারুনুর রশীদ এ ধরনের নির্ভীক কথা শুনে আশ্চর্য হয়ে গেলেন, ওনার সামনে কেউ এ ধরনের কথা বলবে তিনি কখনো কল্পনাও করেন নি। যাক তিনি বেদুইনের সামনে বসে গেলেন এবং বললেন আমি তোমার ফরজ সম্পর্কে কিছু জিজ্ঞেস করতে চাই। তুমি কি তা বলতে পারবে? যদি তুমি তোমার ফরজ সম্পর্কে বলতে পার তবে আমি তোমার অনুসারী হয়ে যাব। বেদুইন বললো, আপনি যে আমাকে প্রশ্ন করবেন, সেটা শিক্ষক হিসেবে, নাকি ছাত্র হিসেবে? বাদশাহ বললেন, ছাত্র হিসেবে। বেদুইন বললো? তাহলে ছাত্রদের মত হয়ে বস। অতঃপর যা জানার আছে জিজ্ঞেস কর। কথামত হারুনুর

রশীদ আদব সহকারে বসলেন এবং সেই ফরজ সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। বেদুইন জবাবে বললো এক ফরজের কথা বলবো? নাকি পাঁচ বা সতের ফরজের কথা বলবো? চৌত্রিশ বা চুরানব্বই ফরজের কথা বলবো? নাকি চল্লিশ থেকে এক ফরজ বলবো? নাকি সারা জীবনের এক ফরজের কথা বলবো? এ লম্বা চওড়া কথা শুনে হারুনুর রশীদ বিদ্রুপ করে বললো, আমিতো আপনাকে এক ফরজের কথা জিজ্ঞেস করলাম আর আপনিতো সারা দুনিয়ার হিসেব নিয়ে বসলেন। বেদুইন লোকটি বললো, হারুন সাহেব, ধর্মে যদি কোন হিসেব না থাকতো, তাহলে কিয়ামতের দিন খালেক মখলুক থেকে কখনো হিসেব নিতেন না। খোদার সেই বাণী কি আপনার স্মরণ নেই وَاِنْ كَانَ مِثْقَالَ حَبَّةٍ مِنْ خَرْدَلٍ اَتَيْنَا بِهَا وَكَفٰى بِنَا حَاسِبِيْنَ সরিষা দানা সম হলেও আমি উপস্থাপন করবো। হিসেব গ্রহণে আমি যথেষ্ট।)

বেদুইন লোকটি হারুনুর রশিদের নাম ধরে সম্বোধন করায় এবং আমীরুল মুমেনীন না বলায় খুবই রাগান্বিত হলো এবং রাগে অস্থির হয়ে বললো খোদার কসম, তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর দিতে না পারলে আমি তোমাকে ছফা-মারওয়া পাহাড়ের মাঝখানে নিয়ে মেরে ফেলবো। বাদশাহের দেহরক্ষী এসে বললো, আমীরুল মুমেনীন, পবিত্র হেরম শরীফের খাতিরে ওকে ক্ষমা করে দিন। বেদুইন এ কথা শুনে অট্টহাসি দিলেন। হারুনুর রশীদ তা দেখে আরও বিস্মিত হলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ রকম হাসলে কেন? বেদুইন জবাব দিল তোমরা উভয়ের কথা শুনে আমার হাসি আসলো। তোমাদের মধ্যে একজন এমন মৃত্যু নিয়ে আসার দাবীদার যেটা আসেনি এবং অন্যজন এমন মৃত্যুকে তাড়াচ্ছে যেটা এসে গেছে। একজন সজাগ ব্যক্তি এ রকম ফালতু কথাকে পাত্তা দেয় না।

হারুনুর রশিদ এ কথা শুনে সীমাহীন লজ্জিত হলেন এবং অনুনয় করে বললেন ভাই আমি তোমার জবাব শুনতে একান্ত আগ্রহী, আল্লাহর ওয়াস্তে আমার প্রশ্নের উত্তরটা দাও।

বেদুইন বললো, ঠিক আছে, তাহলে শুন। তোমার প্রশ্ন সেই ফরজ সম্পর্কে, যেটা আল্লাহ তায়ালা আমার উপর ফরজ করেছেন। আমার উপর আল্লাহ তাআলার অনেক ফরজ রয়েছে। আমি তোমাকে যে এক ফরযের কথা বলেছি, সেটা হচ্ছে দীনে ইসলাম, পাঁচ ফরযের কথা যেটা বলছিলাম, সেটা হচ্ছে পাঁচ ওয়াক্ত নামায,

সতের ফরযের কথা যেটা বলছিলাম সেটা দিনরাত সতের রাকাতের কথা বলেছি। চৌত্রিশ ফরযটা হলো দিনরাতের সিজদা এবং চুরানব্বই ফরজ বলতে ওসব রাকাতের তকবীর সমূহের কথা বলেছি। চল্লিশের মধ্যে এক ফরযের কথা যেটা বলেছিলাম, সেটা হলো চল্লিশ দিনারের মধ্যে এক দিনার যাকাতের কথা বলেছি এবং সারা জীবনে এক ফরযের কথা সেটা বলেছিলাম, সেটা হলো হজ্ব। হারুনুর রশীদ বেদুইনের সুন্দর বর্ণনা ও মাসআলার বিশ্লেষণ শুনে খুবই খুশী হলেন এবং তাঁর মনে ওনার প্রতি অসীম শ্রদ্ধাবোধ সৃষ্টি হলো।

বেদুইন হারুনুর রশীদের প্রশ্নের উত্তর দেয়ার পর বললো, আপনার প্রশ্নের উত্তরতো আমি দিলাম। এবার আমার একটি প্রশ্নের উত্তর কি আপনি দিবেন? বাদশাহ বললেন, নিশ্চয় জিজ্ঞেস করুন। বেদুইন বললো, ওটা কোন্ ধরনের ব্যক্তি যে সকালে এক মহিলাকে দেখলো তখন সেই মহিলা ওর জন্য হারাম ছিল, জোহরের ওয়াক্তের সময় হালাল হয়ে গেল। ইশার সময় হারাম হয়ে গেল, পর দিন সকালে হালাল হয়ে গেল, জোহরের পর হারাম হয়ে গেল। আসরের পর আবার হালাল হয়ে গেল, মাগরীবের সময় হারাম হয়ে গেল, ইশার সময় পুনরায় হালাল হয়ে গেল। হারুনুর রশীদ এটা শুনে বললেন, তুমি আমাকে এমন সমুদ্রে নিক্ষেপ করেছ, যেটা থেকে তুমি ছাড়া অন্য কেউ বের করতে পারবে না। তুমি নিজেই এর উত্তরটা দাও। বেদুইন বললো, আমীরুল মোমেনীন, আপনিতো অনেক বড় প্রভাবশালী শাসক। আমার একটি মামুলী প্রশ্নের ব্যাপারে অপারগতা কেন প্রকাশ করছেন? হারুনুর রশীদ বললেন, ব্যাপার হচ্ছে, আল্লাহ তায়ালা তোমার জ্ঞানের স্তর আমার জ্ঞানের স্তর থেকে উচু করেছেন। আমার একান্ত অনুরোধ এ পবিত্র হেরম শরীফের খাতিরে তুমিই উত্তরটা দাও। বেদুইন বললো, ঠিক আছে, তাহলে শুন, সে এমন একব্যক্তি যে সকালে অন্য জনের বাঁদীকে দেখে ছিল, যেটা ওর জন্য হারাম ছিল। জোহরের সময় সে সেই বাঁদীকে ক্রয় করে নিয়েছিল। তখন সে ওর জন্য হালাল হয়ে গিয়েছিল। আসরের সময় ওকে আযাদ করে দিয়েছিল। তখন সে ওর জন্য হারাম হয়ে গেল। মগরীবের সময় সে ওকে বিবাহ করলো তখন হালাল হয়ে গেল। ইশার সময় তালাক দিয়া দিল, তখন পুনরায় হারাম হয়ে গেল। সকালে তালাক প্রত্যাহার করে নিল তখন পুনরায় হালাল হয়ে গেল। জোহরের সময়ে সেই ব্যক্তি ধর্মদ্রোহী হয়ে গেল, তখন সেই মহিলাটি ওর জন্য পুনরায় হারাম হয়ে গেল, আসরের সময় আবার মুসলমান হয়ে গেল তখন পুনরায় হালাল

হয়ে গেল। মগরীবের সময় সেই মহিলা ধর্মদ্রোহী হয়ে গেল তখন সে হারাম হয়ে গেল। ইশার সময় পুনরায় মুসলমান হয়ে গেল। তখন পুনরায় হালাল হয়ে গেল।

হারুনুর রশীদ এ ব্যাখ্যা শুনে আশ্চর্যান্বিত হয়ে গেলেন। তিনি সেই বেদুইনকে দশ হাজার দিনার দেয়ার নির্দেশ দিলেন। যখন এ দিনার বেদুইনকে দিতে গেল তখন সে গ্রহণ করলো না এবং বললো, এ দিনার এর হকদারকে দাও, আমার কোন প্রয়োজন নেই। হারুনুর রশীদ বললেন, আমি তোমার জন্য কোন একটি জায়গা কি বন্দোবস্ত করে দিব, যেটা তোমার সারা জীবনের জন্য যথেষ্ট হবে? বেদুইন বললো, যে তোমাকে বাদশাহ বানিয়েছে সেই ইচ্ছে করলে আমার নামে কোন জায়গার ব্যবস্থা করে দিবে, তোমার সাহায্যের কোন প্রয়োজন নেই।

হারুনুর রশীদ বেদুইন লোকটি হতে বিদায় হয়ে আসার পথে লোকদের থেকে যখন জানতে পারলেন যে ইনি ইমাম জাফর সাদেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ছেলে মূসা রেযা, যিনি দুনিয়া থেকে বিমুখ হয়ে ধর্মীয় জীবন যাপন করছেন, তখন তিনি পুনরায় ফিরে এসে হযরত মুসা রেযার কপালে চুমু দিলেন।
(আর রাউজুল মশায়েখ ৫৮ পৃঃ)

সবকঃ আহলে বায়তের সদস্যগণ জ্ঞানের সাগর ছিলেন। তৎকালীন বাদশাহগণও জ্ঞানের কদর এবং বুজুর্গানে দীনের সম্মান করতেন।

সপ্তম অধ্যায়

আয়িম্মায়ে কিরাম প্রসঙ্গে বিভিন্ন কাহিনী

কাহিনী নং ৩৫৯

ইমামুল মুসলেমীন হযরত আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত ইমাম আযম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর সরওরে আলম(সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর যিয়ারত উদ্দেশ্যে যখন মদীনা মনোয়ারা পৌঁছলেন এবং রাওজা পাকে হাজির হয়ে যখন আরয করলেন اَلسَّلَامُ عَلَيْكَ يَا سَيِّدَ الْمُرْسَلِيْنَ (হে সৈয়্যেদুল মুরসালিন (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম)! আপনার প্রতি সালাম, তখন রাওজা পাক থেকে সুস্পষ্ট জবাব আসলো وَعَلَيْكَ السَّلَامُ يَا اِمَامَ الْمُسْلِمِيْنَ (হে ইমামুল মুসলেমীন, তোমার প্রতিও সালাম)
(তাজকীরাতুল আউলীয়া- ২৪৬ পৃঃ)

সবকঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হলেন হায়াতুন নবী। তিনি তাঁর বান্দাদের সালাম শুনেন এবং জবাবও দিয়ে থাকেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইমাম আযমকে মুসলমানদের ইমাম বলে স্বীকৃতি দিয়েছেন। কোন ব্যক্তি যদি ইমাম আযমের শানে বে আদবী মূলক শব্দ উচ্চারণ করে, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) নিশ্চয় ওর প্রতি অসন্তুষ্ট হবেন।।

কাহিনী নং ৩৬০

সম্মানিত বুড়ো

হযরত শেখ বুআলী বিন উসমান জালালী (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন আমি সিরিয়ায় থাকালীন এক দিন হযরত বেলাল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মাজার শরীফ যিয়ারত করে তথায় বিশ্রাম নিয়ে ছিলাম এবং সেখানে ঘুমায়ে পড়েছিলাম। আমি স্বপ্ন দেখলাম যে আমি মক্কা শরীফে এবং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে বনী শায়বা দরজা দিয়ে প্রবেশ করতে দেখলাম। তিনি এক বৃদ্ধ

লোককে স্বীয় কোলে রেখে খুবই আদর করে নিয়ে আসতেছেন। আমি দৌড়ে গিয়ে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর পা মুবারকে চুমু দিলাম এবং আমার মনে এ প্রশ্নটি জাগছিল যে এ বৃদ্ধ লোকটি কে, যাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এত আদর করে নিয়ে আস্তেছেন। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এ প্রশ্নের উত্তরে ফরমালেন, ইনি মুসলমানদের ইমাম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু)

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৫০ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযমের সমস্ত মাসায়েল হাদীছ অনুসৃত এবং তাঁর মযহাব হচ্ছে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর প্রদর্শিত পথ। তাঁর ইজতিহাদ এবং শরয়ী মাছায়েল নির্ধারণ পরিপূর্ণভাবে হাদীছে নববীর আলোকে ছিল।

কাহিনী নং ৩৬১

পেশওয়া

একদিন হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন এক জায়গায় যাওয়ার পথে দেখ্লেন যে একটি ছেলে কাঁদামাটির উপর দিয়ে হাঁটছে। তিনি ছেলেটিকে বললেন, বেটা, খুবই সবধানে হাঁট, পা পিচলে গেলে পড়ে যাবে। ছেলেটি বলল, হে আমিরুল মুসলেমীন! আমিতো একা, পিচলে গেলে সাম্লে নিতে পারবো আর পড়ে গেলেও আমি একাই পড়বো। কিন্তু আপনি হচ্ছেন মুসলমানদের পেশওয়া। আপনার নিজের ব্যাপারে আপনাকে খুবই সাবধান হওয়া উচিত, যাতে আপনার পা পিচলে না যায়। কেননা যদি আপনার পা পিচলে যায়, তাহলে আপনার অনুসারী সমস্ত মুসলমানদের পা পিচলে যাবে। ঐ সময় সবাইকে সামলানো খুবই মুশকিল হবে। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ছেলের এ কথা শুনে কেঁদে দিলেন।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৫০ পৃঃ)

সবকঃ ছোট বড় সবাই ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে মুসলমানদের পেশওয়া বলে স্বীকার করেন। ইমাম বা পেশওয়া স্বীয় অনুসারীদের বিরাট জিন্মাদার হয়ে থাকেন।

কাহিনী নং ৩৬২

ইমাম আযমের রাত জাগরন

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) প্রতি রাতে তিনশ রাকাত নফল নামায পড়তেন। একবার তিনি কোন এক জায়গায় যাবার সময় রাস্তায় তাঁকে লক্ষ্য করে এক ব্যক্তি অপর ব্যক্তিকে বললো ইনি সেই ইমাম, যিনি প্রতি রাতে পাঁচশ রাকাত নফল নামায পড়েন। হযরত ইমাম আযম এ কথা শুনে তখনই নিয়ত করে ফেল্লেন যে এখন থেকে পাঁচশ রাকাতই পড়বেন, যাতে ঐ ব্যক্তির ধারণা সঠিক হয়ে যায়। আর একদিন তাঁর শাগরীদগণ তাঁকে বললেন যে, লোকেরা বলাবলি করে যে ইমাম সাহেব সারা রাত ইবাদত করেন এবং ঘুম যান না। এ কথা শুনে তিনি বললেন, আজ থেকে এ রকমই করবো এবং সারা রাত জেগে থাকবো। কেননা আল্লাহ তাআলা ইরশাদ ফরমায়েছেন যে, যে ব্যক্তি এ রকম প্রশংসা পছন্দ করে সেটা ওর মধ্যে নেই, সে কখনো আজাব থেকে মুক্তি পাবে না। অতএব এখন থেকে আমি সারারাত জেগে থাকবো। যাতে এ আয়াতের আওতায় না পড়ি। এরপর থেকে তিনি চল্লিশ বছর এশার অযু দিয়ে ফজরের নামায আদায় করেছেন এবং যে জায়গায় তিনি ইন্তেকাল করেছেন, ওখানে তিনি সাত হাজারবার কোরআন শরীফ খতম করেছেন। (তাজকিরাতুল আউলিয়া- ২৪৯ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) রাত জাগরনকারী ইমাম ছিলেন। তিনি আল্লাহর বড় ইবাদতকারী ও মকবুল বান্দা ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৬৩

নখ পরিমাণ মাটি

একবার বাজার থেকে আসার পথে নখ পরিমাণ কাঁদা মাটি চিট্‌কে এসে ইমাম আযমের কাপড়ে পড়ে। তিনি সঙ্গে সঙ্গে দজলা নদীতে গিয়ে সেই মাটি ঘসে ঘসে ভাল মতে ধুয়ে ফেললেন। লোকেরা তাঁকে বললো, হুযূর আপনিতো এ পরিমাণ ময়লা কাপড়ে লাগলে কাপড় অপবিত্র হয় না বলেন অথচ আপনি নিজে এ সামান্য মাটিকে এভাবে কেন ধৌত করলেন? তিনি বললেন, তোমরা ঠিকই বলেছ, তবে সেটা হলো ফত্ওয়া আর এটা হলো তক্ওয়া।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ১৫১ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম তকওয়া ও পরহেজারীর একান্ত অনুসারী ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৬৪

বিচারকের পদ

খলীফা মনসুর হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে ডেকে নিয়ে বললেন, আপনি আমার রাজ্যের প্রধান বিচারকের দায়িত্ব গ্রহণ করুন। তিনি বললেন, আমি সেই পদের অনুপযুক্ত। খলিফা বললেন, আপনি মিথ্যা বলছেন। এ পদের জন্য আপনার থেকে অধিক উপযোগী আর কে হতে পারে? তিনি বললেন, আমি যদি মিথ্যা বলি, তাহলে আপনি নিজেই ফয়সালা করে দিলেন যে আমি বিচারক হওয়ার অনুপযোগী। কেননা মিথ্যুক বিচারক হতে পারে না। এ কথা বলে তিনি সেখান থেকে উঠে চলে গেলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া - ২৪৮ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগণের কাছে দুনিয়াবী কোন পদবীর প্রতি কোন আগ্রহ থাকে না। এ সব পদের প্রতি তাঁরা কখনো ললায়িত হন না।

কাহিনী নং ৩৬৫

পরিপূর্ণ তাকওয়া

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এক জানাযার নামায পড়তে গিয়েছিলেন। তখন প্রখর রোদ্র ছিল এবং ওখানে কোন ছায়া ছিল না। পাশে এক ব্যক্তির ঘর ছিল, ঐ ঘরের দেয়ালের ছায়া দেখে লোকেরা তাঁকে দেয়ালের ছায়ায় দাঁড়ানোর জন্য বললো। তিনি বললেন, ঐ ঘরের মালিক আমার কাছে ঋণি। আমার ভয় হচ্ছে যে ওর দেয়াল থেকে উপকৃত হওয়াটা আল্লাহর কাছে যদি সুদ হিসেবে গণ্য হয়, তাহলে আমার কি অবস্থা হবে। কেননা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমায়েছেন, যে কর্জ থেকে কিছু মুনাফা নেয়া হয়, সেটা সুদ হিসেবে গণ্য। শেষ পর্যন্ত তিনি রোদ্রতাপে দাঁড়িয়ে রইলেন।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া ২৪৮ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম সাহেব পরিপূর্ণ তাকওয়ার অধিকারী ছিলেন। তিনি বড় মুত্তাকী ও পরহিজগার ছিলেন। তিনি সদা হাদীছকে সামনে রাখতেন।

কুরআনের প্রভাব

বিশিষ্ট বুজুর্গ হযরত ইয়াযিদ বিন লাইছ (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, আমি একবার ইশার নামাযের সময় দেখলাম যে ইমাম সাহেব সূরা যুলযেলা পড়লেন এবং সেই নামাযে ইমাম আযম ছিলেন মুক্তাদী। নামায থেকে ফারেগ হওয়ার পর আমি দেখলাম যে ইমাম আযম চিন্তাযুক্ত হয়ে বসে রইলেন এবং ধীরস্থিরভাবে নিঃশ্বাস ফেলছেন। আমি ওখান থেকে উঠে গেলাম যেন তিনি ধ্যানমগ্ন হয়ে না পড়েন এবং চেরাগটাও জ্বালানো অবস্থায় রেখে আসলাম। তখন চেরাগে মাত্র সামান্য তেল ছিল। ফজর হওয়ার পর আমি দেখলাম যে চেরাগ জ্বলন্ত অবস্থায় রয়েছে এবং ইমাম সাহেব স্বীয় লোম ধরে বলছিলেন, হে আল্লাহ! আপনি তো কনা পরিমাণ নেক কাজের নেক ফল এবং কনা পরিমাণ বদ কাজের বদ ফল দিবেন। আমাকে আপনার মেহেরবানীতে আগুন থেকে রক্ষা করুন। আগুনের কাছেও যেন নিয়ে যাওয়া না হয় এবং আপনার বিশাল রহমতের অন্তর্ভূক্ত করুন। যখন আমি ভিতরে গেলাম তখন ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস কররেন কি চেরাগ নিতে চাচ্ছেন? আমি বললাম আমিতো ফজরের আযান দিয়ে ফেলেছি। তিনি বললেন, যা তুমি দেখেছ গোপন রেখ, প্রকাশ কর না। (জাওয়াহেরুল বয়ান - ৬৮ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) যেমন বড় ইমাম ছিলেন তেমন বড় মুত্তাকীও আরেফ ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৬৭

কিয়ামতের ভয়

একবার হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর পা অজান্তে এক ছেলের পায়ের উপর পড়ে ছিল। তখন ছেলেটি বলেছিল, হে শেখ, কিয়ামতের দিনের বদলাকে কি ভয় করেন না? ইমাম আযম এ কথা শুনে বেঁহুশ হয়ে গেলেন। যখন হুঁশ আসলো তখন বললো আমার মনে হয় এ কথাটি ওকে শিখায়ে দেয়া হয়েছে। (জওয়াহেরুল বয়ান- ৬৯ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এতবড় ইমাম ও মুত্তাকী হওয়া

সত্ত্বেও কিয়ামতের বদলাকে ভীষণ ভয় করেন। অথচ আমরা আপাদ-মস্তক গুনাহের কাজে ডুবে থাকার পরও কিয়ামতের দিনের কোন ভয় আমাদের নেই। ইমাম আযম তাঁর একটি পা অজান্তে অন্য জনের পায়ের উপর পড়ায় কিয়ামতের বদলার ভয়ে বেহুঁশ হয়ে গেলেন। আর অমরা অহরহ জেনে শুনে নানা জুলুম করার পরও কোন পরওয়া করি না।

কাহিনী নং ৩৬৮

প্রতিবেশী মুচী

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মহল্লায় এক মুচী বাস করতো। সে খুব ফুর্তিবাজ ও খোশ মেজাজের লোক ছিল। সে সারা দিন কাজ করতো এবং সন্ধ্যায় বাজারে গিয়ে মাংস ও মদ ক্রয় করে আনতো। রাত কিছুক্ষণ অতিবাহিত হওয়ার পর বন্ধু বান্ধব নিয়ে আসর বসাতো এবং নিজ হাতে শিক কাবাব তৈরী করে নিজেও খেতো এবং বন্ধু বান্ধবদেরও খাওয়াতো। এর সাথে মদও পরিবেশন করা হতো। মদের আনন্দে আত্মহারা হয়ে সে গেয়ে উঠতো

اَضَا عُوْنِى وَاَىَّ فَتٰى اَضَاعُوْا - لِيَوْمِ كَرِيْهَةٍ وَّسَدَادِ ثَغر

অর্থাৎ লোকেরা আমার মত একজন বীর পুরুষকে অকেজো করে দিল। যুদ্ধ ময়দানে ও নানা বাঁধা বিপত্তিতে আমাকে ব্যবহার করতে পারতো।

ইমাম আযম জিকির-আজকার ও অন্যান্য কারণে রাত্রে খুব কমই শুইতেন। প্রতি রাতে সেই মুচীর চেচাঁ মেচি তাঁর কানে ভেসে আসতো কিন্তু তিনি কোন প্রতিবাদ করতেন না। এক রাত্রে শহরের পুলিশ অফিসার ইমামের বাড়ীর পাশের পথ দিয়ে যাবার সময় ওকে মাতলামী করতে দেখে ধরে নিয়ে গেল এবং হাজতে পাঠিয়ে দিল। সকাল বেলা ইমাম সাহেব তাঁর লোকদেরকে বললেন, গতরাতে আমার প্রতিবেশীর কোন আওয়াজ পেলাম না, কি হলো বুঝতে পারলাম না। লোকেরা ওনাকে জানালো যে বেচারাকে পুলিশ বন্দী করে নিয়ে গেছে। এ কথা শুনে ইমাম তক্ষনি বাহন তলব করলেন এবং দরবারী পোষাক পরিধান করে গভর্ণর ভবনের দিকে রওয়ানা দিলেন। কূফার গভর্ণর যখন জানতে পারলেন যে ইমাম আযম তাঁর সাতে দেখা করতে আসতেছেন, তখন তিনি ইমামের অভ্যর্থনার জন্য

দরবারী লোকদেরকে পাঠিয়ে দিলেন। ইমামের বাহন গভর্ণর ভবনের কাছে গেলে, গভর্ণর নিজেই তাঁর অভ্যর্থনার জন্য এগিয়ে গেলেন এবং খুবই ইজ্জত সম্মানের সাথে দরবারে নিয়ে গিয়ে বসালেন এবং আরয করলেন, আপনি কেন এত কষ্ট করে আসলেন, আমাকে তলব করলে আমি নিজেই আপনার সমীপে হাজির হয়ে যেতাম। ইমাম সাহেব বললেন, আমার মহল্লায় এক মুচী থাকতো। গত রাতে ওকে শহরের পুলিশ অফিসার গ্রেপ্তার করে নিয়ে এসেছে। আমি ওর মুক্তি চাই। গভর্ণর তখনই নির্দেশ পাঠালেন এবং ওকে মুক্তি দিল। গভর্ণর ভবন থেকে বিদায় হয়ে আসার পথে সেই মুচীও তাঁর পিছু নিলেন। ইমাম ওকে লক্ষ্য করে বললেন, তোমার কোন ক্ষতি করি নাই তো? সে বললো না, না, আপনি যথার্থ প্রতিবেশীর হক আদায় করেছেন।ইমামের এ আচরণে সে এত প্রভাবান্বিত হলো যে বিলাসিতা ও বদ অভ্যাস ত্যাগ করে ইমামের দরসে নিয়মিত বসতে লাগলো এবং ক্রমান্বয়ে ফিকাহ শাস্ত্রে যথেষ্ট জ্ঞান অর্জন করলো এবং পরবর্তীতে ওকে একজন ফিকাহবিদ হিসেবে গণ্য করা হতো।

(হায়াতুল হায়ওয়ান ১১৮ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন তাঁর প্রতিবেশীদের জন্য একজন উত্তম প্রতিবেশী। তাঁর সুদৃষ্টিতে একজন আয়াশী লোকের জীবনে আমূল পরিবর্তন এসে গিয়েছিল এবং ইমামের সংশ্রবে ফিকাহ শাস্ত্রে বিশেষ জ্ঞান লাভ করেছিল।

কাহিনী নং ৩৬৯

ইহসান ও দয়া

হযরত শফীক (রহমতুল্লাহে আলাইহে) বলেন, একবার আমি ইমাম আযমের সাথে কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলাম। পথে এক ব্যক্তি তাঁকে দেখে লুকায়ে গেল এবং পথ পরিবর্তন করলো। ইমাম তাকে দেখে ফেললেন এবং ডাক দিলেন। সে কাছে আসলে, তিনি জিজ্ঞেস করলেন, তুমি আমাকে দেখে অন্যদিকে চলে যাচ্ছিলে কেন? সে বললো, আমি আপনার কাছে ঋনি। আপনি আমার কাছে দশ হাজার দেরহাম পাবেন। অনেক দিন হয়ে গেল, অভাবের কারণে পরিশোধ করতে পারিনি। তাই আপনার কাছে খুবই লজ্জিত। ইমাম সাহেব বললেন, সুবহানাল্লাহ! আমার জন্য তোমার এ অবস্থা! যাও আমি তোমাকে সব টাকা বখশিশ করে

দিলাম। আগামীতে আমাকে দেখলে লুকিও না। আর আমার কারণে তোমার মনে যে ভয়ের সৃষ্টি হয়েছে, সেটার জন্য আমাকে মাফ করে দিও।

(জওয়াহেরুল বয়ান ৭৪ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বড় আবেদ, দানী এবং মানব দরদী ছিলেন। তাঁরই পদাঙ্ক অনুসরণ করে মজলুমদের প্রতি দয়া করা, দুনিয়াবী মহব্বত থেকে মুক্ত থাকা আমাদের উচিত।

কাহিনী নং ৩৮০

অন্তর্দৃষ্টি

কয়েক জন ছেলে বল খেলছিল। হঠাৎ ওদের বলটা ইমাম আযমের সামনে এসে পড়ে। ইমামের সম্মুখ থেকে বলটি উঠায়ে নেয়ার কারো সাহস হলো না। একটি ছেলে ওদেরকে বললো, তোমরা বললে, আমি বলটি এনে দিতে পারবো। অতঃপর সে একান্ত অভদ্রভাবে ইমামের সামনের থেকে বলটি নিয়ে আসলো। ইমাম আযম ছেলেটি দেখে বললেন, মনে হয় ছেলেটি জারজ সন্তান। লোকেরা খোজ খবর নিয়ে জানতে পারলো যে ছেলেটি সত্যিই জারজ। লোকেরা ইমামের কাছে জিজ্ঞেস করলো, হুযুর, আপনি এটা কি করে জানতে পারলেন যে ছেলেটি অবৈধ? বললেন, যদি সে বৈধ হতো, তাহলে সে এ কাজটি করতে লজ্জাবোধ করতো।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া-২৪৮ পৃঃ)

সবকঃ বুজুর্গানে কিরামের প্রতি লজ্জাবোধ থাকা এবং ওনাদেরকে সম্মান করা নেকবখতী ও শরাফতের নিদর্শন।

কাহিনী নং ৩৭১

লা-জবাব

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিরোধীতাকারীদের একজন একবার তাঁকে জিজ্ঞেস করলো– এমন ব্যক্তির ব্যাপারে আপনার কি ফতওয়া, যে জান্নাতের আশাবাদী নয় এবং দোযখকে ভয় করে না, খোদাকেও ভয় করে না, মৃত ভক্ষন করে, রুকু সিজদা বিহীন নামায পড়ে, না দেখে সাক্ষ্য দেয়, সত্য কথাকে অপছন্দ

করে, ফিতনাকে ভালবাসে, রহমত থেকে পালায় এবং ইহুদী নাচারার ব্যাপারে বিশ্বাস করে। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ বিষয়ে তাঁর শাগরীদদের কাছে তাদের অভিমত জানতে চাইলেন। তাঁরা বললেন- এ রকম ব্যক্তি খুবই খারাপ এবং এ সব আচরন কুফরী। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মুচকি হেসে বললেন, তোমাদের ধারনা ভুল। এ ধরনের ব্যক্তি আল্লাহর প্রিয় বান্দা এবং পরিপূর্ণ মুমিন। ইমাম সাহেব উত্তর দেয়ার আগে প্রশ্নকারীকে বললেন, আমি যদি সঠিক উত্তর দিতে পারি, আমার বদনামী করা থেকে বিরত থাকবেতো? সে ওয়াদা করলো, নিশ্চয় বিরত থাকবো। ইমাম সাহেব বললেন, সে জান্নাত নয়, জান্নাতের রবের আশাবাদী এবং দোযখকে নয়, দোযখের সৃষ্টিকর্তাকে ভয় করে। আল্লাহকে এ ব্যাপারে ভয় করে না যে আল্লাহ ওর প্রতি জুলুম করবে। সে মৃত মাছ খায়, জানাযার নামায পড়ে, নবী করীম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর উপর দরূদ পাঠ করে, সে আল্লাহকে না দেখে সাক্ষ্য দেয়, সে মৃত্যুকে অপছন্দ করে যেন জীবিত থেকে আল্লাহর আনুগত্য করতে পারে, সে ফিতনা অর্থাৎ ধন-দৌলত, সন্তান-সন্ততিকে ভাল বাসে, এবং সে যে রহমত থেকে পালায়, সেটা হচ্ছে বৃষ্টি। নাচারাদের ব্যাপারে ঐ কথাটি বিশ্বাস করে لَيْسَتِ النَّصَارٰى عَلٰى شَيْءٍ (নাচারারা কোন কিছুর উপর নেই) এবং ইহুদীর ব্যাপারে সেই কথায় বিশ্বাস করে لَيْسَتِ الْيَهُوْدُ عَلٰى شَيْءٍ (ইহুদীরা কোন কিছুর উপর নেই)

প্রশ্নকারী লোকটি যখন এ জ্ঞানগর্ব ও লা-জবাব উত্তর পেল, তখন দাড়িয়ে ইমামের কপালে চুমু দিল এবং কসম করে বললো– আপনি সত্যের উপর আছেন। (জওয়াহেরুল বয়ান-৪৮ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের ইমাম আযমকে আল্লাহ তাআলা এমন জ্ঞান দান করেছেন যে, যে সব কঠিন কঠিন মাছায়েলের ব্যাপারে অন্যরা অপারগতা প্রকাশ করতো, সে সব মাছায়েলের ব্যাপারে তিনি মুহূর্তের মধ্যে সমাধান দিতে পারতেন। তাঁর এ দক্ষতার কথা বিরোধীতাকারীরাও স্বীকার করতো।

কাহিনী নং ৩৭২

মারাত্মক ধোঁকা

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীদের কয়েকজন মিলে এক মহিলাকে ফুঁশলায়ে সম্মত করালো যে সে যেন যে কোন উপায়ে ইমাম

আযমের বদনাম রটায়। সে মতে মহিলাটি এক রাত্রে ইমাম আযমের কাছে গিয়ে বললো, আমার স্বামী মারাত্মক রোগে আক্রান্ত। সে আপনার সামনে কিছু অসীয়ত করতে চাচ্ছে। তাই আপনি মেহেরবানী করে আমার ঘরে চলুন। ইমাম সাহেব ওর সাথে গেলেন এবং যখন ওর ঘরে পৌঁছলেন,তখন সে ঘরের দরজা বন্ধ করে দিয়ে এ বলে চিৎকার করতে লাগলো- আবু হানিফা আমার উপর অত্যাচার করছে। এ আওয়াজ শুনে বিদ্বেষপোষণকারীরা সঙ্গে সঙ্গে ওখানে পৌঁছে গেল এবং ইমাম সাহেব ও সেই মহিলাকে খলীফার কাছে নিয়ে গেল। খলীফা ইমাম সাহেব ও মহিলাকে কারাগারে পাঠিয়ে দিলেন এবং বললেন, সকালে বিচার হবে। ইমাম আযম সারা রাত নফল নামাযে নিয়োজিত রইলেন। মহিলা এটা দেখে খুবই লজ্জিত হলো এবং ইমাম সাহেবের পায়ে পড়ে আসল ব্যাপার ফাঁস করে ক্ষমা চাইলো। ইমাম সাহেব বললেন, ঠিক আছে আমি তোমাকে ক্ষমা করে দিব। তবে তোমাকে একটি কাজ করতে হবে। তুমি কোন একটি বাহানা করে জেল দারোগার অনুমতি নিয়ে কিছুক্ষণের জন্য জেল থেকে বের হয়ে সোজা আমার ঘরে চলে যাও এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করে তোমার পরিবর্তে উম্মে হাম্মাদকে (ইমামের স্ত্রী) এখানে পাঠিয়ে দাও। ইমামের কথা মত মহিলাটি জেল দারোগার অনুমতি নিয়ে জেল থেকে বের হয়ে গেলো এবং সকাল হওয়ার আগেই ইমামের স্ত্রী সাহেবাকে জেলে পাঠিয়ে দিল। সকাল হওয়ার সাথে সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীরা রায় শুনার জন্য আদালতে গিয়ে ভিড় জমালো। খলীফার নির্দেশে ইমাম আযম ও মহিলাকে তলব করা হলো। খলীফা ইমাম সাহেবকে বললেন, হে আবু হানিফা! একজন অপরিচিত মহিলার সাথে বন্ধ ঘরে দহরম মহরম করা কি আপনার জন্য জায়েয ছিল? ইমাম আযম জানতে চাইলেন, কোন্ মহিলার সাথে? খলীফা বললেন, এ মহিলা, যিনি সামনে বসে আছে। ইমাম আযম বললেন, উম্মে হাম্মাদের পিতাকে ডাকলে ভাল হয়। উনিই সনাক্ত করবেন এ মহিলাটি কে? সে মতে ইমাম সাহেবের শ্বশুরকে ডাকা হলো। ইমাম সাহেব তাঁর শ্বশুরকে লক্ষ্য করে বললেন, আপনি এ মহিলার ঘোমটা উঠায়ে সনাক্ত করুন, এ মহিলাটি কে? উম্মে হাম্মাদের পিতা ঘোমটা উঠায়ে দেখা মাত্র বলে উঠলেন, হে আবু হানিফা এটাতো আমার মেয়ে, যাকে আপনার সাথে বিবাহ দিয়েছি। এতে কি হয়েছে এবং এত হৈ চৈ কিসের?

এ কথা শুনে বিদ্বেষকারীরা হতভম্ব হয়ে গেল এবং খুবই নাজেহাল হলো আর

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিজয় ঘোষিত হলো।

(নজহাতুল মাজালিস - ৭৩ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযমের প্রতি বিদ্বেষপোষণকারী আগেও ছিল এখনও আছে এবং আগেও নাজেহাল হয়েছে এখনও হচ্ছে।

কাহিনী নং ৩৭৩

ইমাম মালেক ও ইমাম আযমের কথোপকথন

একদিন হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) এর মজলিসে যোগদান করেন। কিন্তু ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁকে চিনতে পারেন নি। তিনি মজলিসে একটি মাস্‌আলা উত্তাপন করলেন। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) দক্ষতার সাথে সেটার জটপট জবাব দিলেন। ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর দিকে দেখলেন এবং জিজ্ঞেস করলেন, এ লোকটি কোথায় থেকে এসেছে? ইমাম আযম নিজেই বললেন, জনাব আমি ইরাক থেকে এসেছি। ইমাম মালেক বললেন, সেটাতো নেফাক (মুনাফেক) ও দোদুল্যমান ব্যক্তিদের শহর। ইমাম আযম বললেন, আমাকে কুরআন মজীদ থেকে কিছু পাঠ করার অনুমতি দিবেন? ইমাম মালেক বললেন, হ্যাঁ হ্যাঁ নিশ্চয় পাঠ কর। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এ আয়াত পাঠ করলেন-

وَمِمَّنْ حَوْلَكُمْ مِّنَ الْاَعْرَابِ مُنَافِقُوْنَ وَمِنْ اَهْلِ الْعِرَاقِ مَرَضُوْا عَلَي النِّفَاقِ

(এবং তোমাদের আশ পাশের কিছু বেদুইন লোক মুনাফিক এবং কিছু সংখ্যক ইরাকবাসী। মুনাফেকী ওদের অভ্যাসে পরিণত হয়েছে)।

ইমাম আযম উল্লেখিত আয়াতে ইচ্ছাকৃতভাবে اهل المدينة(মদীনাবাসী) এর স্থলে اهل العراق (ইরাকবাসী) পড়েছেন, যেন ইমাম মালেক ইরাক সম্পর্কে তাঁর উক্তির প্রতিউত্তর পেয়ে যায়।

ইমাম মালেক আয়াতটি শুনে সঙ্গে সঙ্গে বলে উঠলেন, কুরআনেতো এ রকম নেই। ইমাম আযম জানতে চাইলেন, কুরআনে কি রকম আছে? ইমাম মালেক বললেন, কুরআনেতো এই রকমই আছে -

اَهْلِ الْمَدِيْنَةِ مَرَضُوْا عَلَى النِّفَاقِ

(কিছু সংখ্যক মদীনাবাসীর স্বভাব হয়ে গেছে মুনাফেকী) ইমাম আযম বললেন, আল্লাহর শোকর, যে উক্তিটা আমার বেলায় প্রয়োগ করা হয়েছিল, সেটা আল্লাহ তাআলা আপনার উপর প্রয়োগ করেছেন। (উল্লেখ্য যে ইমাম মালেক ছিলেন মদীনাবাসী) এ কথাটি বলে ইমাম আযম মজলিস থেকে বের হয়ে আসলেন। ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) যখন জানতে পারলেন সেই বিচক্ষণ ব্যক্তিটা হলেন ইমাম আবু হানিফা, তখন তিনি ওনাকে ডেকে নিলেন এবং খুবই ইজ্জত সম্মান করলেন।

(নজহাতুল মাজালিস- ১৩৭ পৃঃ ২ জিঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) উপস্থিত জবাব দানে বিশেষ পারদর্শী ছিলেন। বড় বড় মুহাদ্দেস ও ইমামগণ তাঁকে ইজ্জত করতেন।

কাহিনী নং ৩৭৪

বধূ বদল

এক ব্যক্তি একই দিন ওর দু'ছেলের জন্য অন্য ব্যক্তির দু'মেয়েকে বধূ হিসবে ঘরে এনে ছিল। পরদিন ওলীমার দাওয়াত ছিল। সেখানে আলেমদেরকে দাওয়াত দেয়া হয়েছিল। সে দাওয়াতে হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু)ও তশরীফ নিয়ে গিয়েছিলেন। ছেলেদের পিতা খুবই মর্মাহত ও চিন্তাযুক্ত অবস্থায় ঘরের বাইরে এসে আলেমগণের সমীপে আরজ করলো, 'একটি বড় সমস্যা হয়ে গেছে। রাত্রে ভুল বশতঃ বধূ বদল হয়ে গেছে। বড় বধূ ছোট ছেলের কামরায় এবং ছোট বধূ বড় ছেলের কামরায় চলে গিয়েছিল। সকালে এ ভুল ধরা পড়ে। বলুন, এখন কি করা যায়? হযরত সুফিয়ান (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) বললেন, চিন্তার কিছু নেই, এটা সাদৃশ্যের কারণে মিলন হয়েছে। মিলনের কারণে দু'ভাই এর উপরমোহর ওয়াজিব হয়ে গেছে। আজ বোনদ্বয় নিজ নিজ স্বামীর ঘরে চলে যাবে। হযরত ইমাম আযম নিশ্চুপ ছিলেন। ছেলেদের পিতা তাঁর অভিমত জানতে চাইলো। হযরত সুফিয়ান বললেন, আমি যা বলছি তা ছাড়া উনি আর কি বললেন? হযরত ইমাম আযম বললেন, আমার কাছে ছেলেদ্বয়কে নিয়ে এসো। কথামত ছেলেদ্বয়কে আনা হলো। তিনি উভয়কে আলাদাভাবে জিজ্ঞেস করলেন, যে মহিলার

সাথে রাত্রি যাপন করেছে সে মহিলা পছন্দ হয়েছে কিনা? উভয়ে হ্যাঁ বললো। তিনি বললেন, তোমরা নিজ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দাও এবং যার সাথে রাত্রি যাপন করেছ, ওকে বিবাহ কর। অতঃপর উভয় নিজ নিজ স্ত্রীকে তালাক দিয়ে দিল এবং মিলন না হওয়ায় ইদ্দত পালনের প্রয়োজন হয় নি। সাথে সাথে যার সাথে রাত্রি যাপন করেছিল ওকে বিবাহ করে নিল।

(জওয়াহেরুল বয়ান - ৮৬ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমামের বুদ্ধিমত্তা ও দূরদর্শীতা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। দেখুন, এ কঠিন মাস্‌আলাটি তিনি কি সুন্দর ভাবে সমাধান করে দিয়েছেন। তাঁর এ ফিকহি দক্ষতার দ্বারা আল্লাহর বাণী ও রসূলের হাদীছ অনুসারে তিনি অনেক দিক নির্দেশনা দিয়েছেন। তাঁর সেই দিক নির্দেশনার বদৌলতে আজ আমরা অনেক মাস্ আলা সহজে হৃদয়ঙ্গম করতে সক্ষম হচ্ছি।

কাহিনী নং ৩৭৫

ফটক

এক ব্যক্তি আলো বাতাসের জন্য তার নিজের দেয়ালে একটি ফটক করতে চাইলো। কিন্তু এতে প্রতিবেশী বাঁধা দিল। সে বাধ্য হয়ে কাজী ইবনে আবিল আলার আদালতে ফটক করার অনুমতি চেয়ে আবেদন পেশ করলো। কাজী বিবাদীর বক্তব্য শুনে ওর পক্ষে রায় দিলেন, ফটক করার অনুমতি দিলেন না।

আমাদের ইমাম আযমকে এ বিষয়টা জানালে তিনি লোকটিকে পরামর্শ দিলেন যে তুমি আদালতে সেই দেয়ালটি ফেলে দেয়ার আবেদন কর। লোকটি তা-ই করলো এবং অনুমতিও পেয়ে গেল। প্রতিবেশী এ খবর পেয়ে তাড়াতাড়ি কাজীর দরবারে গিয়ে আর্জি পেশ করলো যে দেয়াল ভেঙ্গে ফেলার অনুমতির চেয়ে ফটক করার অনুমতি অনেক সহায়ক হবে। অতএব ফটক করার অনুমতি দেয়া হোক। কাজী সাহেব বিষয়টা বুঝতে পারলেন এবং বিনাবাক্যে ফটক করার অনুমতি দিয়ে দিলেন।

(জাওয়াহেরুল বয়ান- ৮৮ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম সাহেবের কাছে যে কেউ যে কোন সমস্যা নিয়ে আসলে এর সমাধান পেয়ে যেত। তিনি দারুন বিচক্ষণ ও বিদ্ধাবুদ্ধির অধিকারী ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৭৬

তদবীর ও হেকমত

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এক প্রতিবেশী যুবক একদিন তাঁর কাছে এসে বললো, হুযূর আমি একটি মেয়েকে বিবাহ করতে চাচ্ছি। ওর পরিবারও আমার কাছে বিবাহ দিতে রাজি আছে। কিন্তু আমার সাধ্যের অতিরিক্ত মোহরানা দাবী করছে। এখন আমি কি করতে পারি? ইমাম আযম বলবেন, কি আর করবে, ওদের শর্ত মেনে বিবাহ করে ফেল। ইমামের পরামর্শ মতে সে মেয়েটাকে বিবাহ করলেন। কিন্তু বধূ বিদায়ের বেলায় সমস্যা দেখা দিল। মেয়ের পরিবার সম্পূর্ণ মোহরানা আদায় ব্যতিরেকে মেয়ে বিদায় করতে অস্বীকার করলো। এখন কি করা যায়। আবার ইমাম আযমের কাছে ধর্ণা দিল। ইমাম আযম পরামর্শ দিলেন যে তুমি কারো থেকে কর্জ নিয়ে মোহরানা আদায় করে দাও। ইমামের পরামর্শ মত সে কয়েক জন থেকে কর্জ নিলেন। ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) নিজেও ওকে কিছু কর্জ দিলেন। অতঃপর সে মোহরানা আদায় করে দিল এবং ওরাও মেয়েকে বিদায় দিল। পরদিন ইমাম আযম ওকে বললেন, তুমি তোমার শ্বশুর বাড়ীতে গিয়ে বল- আমি আমার স্ত্রীকে নিয়ে কয়েক দিনের মধ্যে অনেক দূরে কোন এক জায়গায় চলে যাবার মনস্থ করেছি। সে শশুর বাড়ীতে গিয়ে তা-ই বললো। শ্বশুর বাড়ীর লোকেরা এ কথা শুনে খুবই চিন্তিত হয়ে পড়লো এবং ইমাম আযমের কাছে এসে অভিযোগ করলো এবং তাঁর অভিমত চাইলো। ইমাম সাহেব বললেন বউকে যেখানে ইচ্ছে সেখানে নিয়ে যাবার অধিকার স্বামীর রয়েছে। ওরা বললো, মেয়েটা আমাদের দৃষ্টির অগোচরে চলে যাওয়াটা আমাদের মোটেই সহ্য হবে না। ইমাম সাহেব বললেন, তোমরা ওর থেকে যা নিয়েছ সেটা ফেরত দিয়ে ওর মত পরিবর্তন করাতে পার। ওরা এতে রাজি হলো। ইমাম সাহেব তাঁর প্রতিবেশী যুবককে ডেকে বললো, ওরা তোমার থেকে যে টাকা নিয়েছে সেটা ফেরত দিতে রাজি হয়েছে, তুমি তোমার মত পরিবর্তনের কথা ওদেরকে জানিয়ে দাও। সে বললো, এ সুযোগে আমি ওদের থেকে আরও অধিক দাবী করবো। ইমাম সাহেব বললেন, আমি যা বলছি তা কি তুমি শুনবে? নাকি যাদের থেকে কর্জ নিয়েছ তাদেরকে বলবো তাদের কর্জ আদায় ব্যতিরেকে তোমাকে বাইরে যেতে না দেয়? সে বললো; হুযূর আল্লাহর ওয়াস্তে এ কথা মুখে আনবেন না, ওরা শুনলে

আমাকে এক পয়সাও দিবে না। (লতায়েফে এলমিয়া - ১৪২ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) খুবই সুক্ষ্ম জ্ঞান ও তীক্ষ্ম বুদ্ধির অধিকারী ছিলেন। তিনি অতি সহজে যে কোন সমস্যার সমাধান দিতে পারতেন।

কাহিনী নং ৩৭৭

হারানো বস্তু

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে এক ব্যক্তি তার কিছু মূল্যবান বস্তু মাটিতে পুঁতে রেখে ছিল। কিন্তু নির্দিষ্ট স্থানটি ভুলে গিয়েছিল। সে ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে হাজির হয়ে ঘটনাটি বর্ণনা করলো। হযরত ইমাম আযম ওকে বললেন, তুমি আজ সারা রাত নামাযে নিয়োজিত থেকো। ইনশা আল্লাহ তোমার মাল কোথায় পুঁথে রেখেছ স্মরণ হবে। লোকটি তাই করলো, বাড়ীতে গিয়ে রাত্রে নামায পড়তে শুরু করলো। কয়েক রাকাত পড়তে না পড়তে মাল পুঁতে রাখার স্থানটি ওর স্মরণ হয়ে গেল এবং খুবই খুশী হলো। সকালে ইমাম সাহেবের খেদমতে হাজির হয়ে বললো হুযূর আপনি যে তদবীর শিখায়ে দিয়েছেন সেটার বদৌলতে বেশী সময় লাগলো না, অল্প সময়ের মধ্যে আমার স্মরণ হয়ে গেল। ইমাম আযম বললেন, আমার জানা ছিল, শয়তান তোমাকে সারা রাত নামায পড়ার সুযোগ দিবে না। তোমার মালের কথা স্মরণ করায়ে দিবে যেন তুমি নামায ত্যাগ কর। তবে শুকরীয়া হিসেবে তোমার সারা রাত নামায পড়া উচিত ছিল। (জওয়াহেরুল বয়ান- ৯৬ পৃঃ)

সবকঃ মানুষ মসীবতে পড়লে আল্লাহকে স্মরণ করে কিন্তু মসীবত দূরীভূত হয়ে গেলে আল্লাহকে ভুলে যায়। এটা খুবই দুঃখজনক ব্যাপার। এ রকম না হওয়া উচিত।

কাহিনী নং ৩৭৮

জামাতা

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে এক ব্যক্তি আমীরুল মুমেনীন হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর প্রতি খুবই বিদ্বেষ পোষণ করতো, এমন কি সে হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) কে (মাযাল্লা) ইহুদী

বলতো। হযরত ইমাম আযম কথাটি যখন জানতে পারলেন, তখন একদিন ঐ লোকটিকে তিনি ডেকে আনালেন এবং বললেন, আমি তোমার মেয়ের জন্য একটি ভাল পাত্রের খোঁজ পেয়েছি। ছেলেটি সবদিক দিয়ে উপযুক্ত। শুধু একটি মাত্র দুর্বলতা আছে। সেটি হচ্ছে ছেলেটা ইহুদী। লোকটি বড় আফসোস করে বললো; আপনি একজন এত বড় ইমাম হয়ে একটি মুসলমান মেয়ের বিবাহ ইহুদীর ছেলের সাথে কি করে জায়েজ মনে করলেন? আমি এ বিবাহ কক্ষনো জায়েয মনে করি না। হযরত ইমাম আযম বললেন, আশ্চর্যের বিষয়, তোমার না জায়েয বুঝার কি আছে, যেখানে স্বয়ং হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) তাঁর দু'কন্যা এক ইহুদীর সাথে বিবাহ দিয়েছেন। লোকটি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলো, ইমাম সাহেব তাকে কি বিষয়ে হেদায়ত করতে চেয়েছেন। তখন থেকে লোকটি হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ব্যাপারে খারাপ ধারণা থেকে বিরত রইলেন এবং ইমাম আযমের বদৌলতে সঠিক পথের সন্ধান পেলেন। (তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৫০)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযম বড় কৌশলী হেদায়েতকারী ছিলেন। উপরোক্ত কাহিনী থেকে এটাও বুঝা গেল হযরত ওসমান (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শানে বেআদবী করা মূলতঃ হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর শানে বেআদবী করার শামিল।

কাহিনী নং ৩৭৯

স্বামী স্ত্রীর ঝগড়া

হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে এক দম্পতির মধ্যে কোন একটি কথা নিয়ে মনমালিন্য হওয়ায় স্বামী রাগতস্বরে বলে ফেললো তুমিই প্রথমে কথার সূত্রপাত না করলে আমি তোমার সাথে কথা বলবো না। স্ত্রীও কসম করে বললো, আমিও তোমার সাথে কখনো কথা বলবো না, যতক্ষণ না তুমি আমার সাথে প্রথমে কথা না বল। এর পর একে অপরের সাথে কথা বলা ত্যাগ করলো এবং মহা সমস্যায় পড়ে গেল। শেষ পর্যন্ত স্বামী ইমাম আযমের স্মরণাপর্ণ হলো এবং সম্পূর্ণ ঘটনা বর্ণনা করলো। ইমাম সাহেব ঘটনা শুনে বললেন, যাও একে অপরের সাথে সানন্দে কথা বলতে শুরু কর, শপথ ভঙ্গের অভিযোগে কেউ অভিযুক্ত হবে না। কেননা তুমি বলে ছিলে যে, যে পর্যন্ত সে প্রথমে তোমার সাথে

কথা না বলবে তুমি ওর সাথে কথা বলবে না এরপর স্ত্রী যদি নিশ্চুপ থাক তো তাহলে তুমি কথা বললে শপথ ভঙ্গকারী বলে সাব্যস্ত হতে। কিন্তু সে যখন বললো আমিও তোমার সাথে কথা বলবো না যতক্ষণ না, তুমি আমার সাথে প্রথমে কথা না বল, তখন সে তো তোমার সাথে প্রথমে কথা বলে ফেললো। অতএব এখন তুমি ওর সাথে কথা বলতে পার।

(জওয়াহেরুল বয়ান-৯৫ পৃঃ)

সবকঃ উপরোক্ত ঘটনায় ইমাম আযমের জ্ঞানের গভীরতা প্রকাশ পায়।

কাহিনী নং ৩৮০

চোরদের ফন্দি

এক ব্যক্তির ঘরে কয়েকজন পরিচিত চোর ঢুকে ছিল। ঘরের মালিকের ঘুম ভেঙ্গে যাওয়ায় ওদেরকে দেখে ফেললো এবং চিনে ফেললো। চোরেরা ভাবলো যে সে সকালে সবাইকে বলে দিবে এবং আমাদেরকে ধরে ফেলবে। তাই ওরা সবাই ওকে ঝাপটে ধরে এবং হুমকি দিয়ে বললো, তোমাকে শপথ করে বলতে হবে যে আমাদের কথা কাউকে বলবে না, বল্‌লে তোমার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। যে জানের ভয়ে এতে রাজি হলো এবং কাউকে বলবে না বলে শপথ করলো। চোরেরা এ শপথ আদায় করে ঘরের মাল পত্র যা কিছু পেল সব নিয়ে চলে গেল। সকাল বেলা চোরেরা ওর সামনে ঘুরাফেরা করতেছিল কিন্তু সে কাউকে কিছু বলতে পারছিল না, কারণ বললে ওর স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। শেষ পর্যন্ত সে হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গেল এবং বললো, হুযূর চোরেরা আমার ঘরের সব কিছু চুরি করে নিয়ে গেল অথচ আমি চোরদেরকে ভালমতে চিনি। কিন্তু আমি কাউকে বলতে পারতেছিনা। কারণ ওরা আমাকে এভাবে শপথ করায়েছে যে আমি যদি কাউকে বলি- এরা আমার ঘর চুরি করেছে, তাহলে আমার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। তিনি ওর কথা শুনে মহল্লার গণ্যমান্য ব্যক্তিদেরকে ডাকলেন এবং বললেন, এ বেচারাকে চোরেরাতো একবারে সর্বস্বান্ত করে ফেললো। আপনারা একটু সহযোগিতা করলে আমি চোর ধরে ফেলতে পারবো ইনশা আল্লাহ। আপনারা এলাকার অসৎ প্রকৃতির লোকদেরকে একটি হল ঘরে জমায়েত করার ব্যবস্থা করুন। ওনারা তাই করলেন। ইমাম সাহেব যার ঘর

চুরি হয়েছে সেই লোকটিকে নিয়ে হল ঘরে গেলেন এবং লোকটিকে দরজার সামনে দাঁড় করায়ে বললেন, হল থেকে এক জন এক জন বের হবে এবং আমি তোমাকে জিজ্ঞেস করবো-এ তোমার চোর কিনা। যদি তোমার চোর না হয়, তাহলে না বলতে থেকো আর চোর হলে নিশ্চুপ থেকো, কিছু বলিও না। কারণ তুমি শপথ করেছ যে কিছু বললে তোমার স্ত্রী তিন তালাক হয়ে যাবে। তাই কিছু বলার প্রয়োজন নেই, তুমি নিশ্চুপ থাক্‌লে আমি বুঝে ফেলবো। এভাবে এক এক জন করে হলঘর থেকে বের করা হলো এবং ইমাম সাহেব জিজ্ঞেস করতে রইলেন, এ তোমার চোর কিনা। সে না না বললো এবং চিহ্নিত চোরের বেলায় নিশ্চুপ রইলো। এতে সব চোর ধরা পড়ে গেল এবং ওর স্ত্রীও তালাক থেকে রক্ষা পেয়ে গেল।

সবকঃ আল্লাহ তাআলা আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে অগাধ জ্ঞান বুদ্ধি দান করে ছিলেন। তিনি যে ধরনের কঠিন সমস্যা হোক না কেন, অনায়াসে সমাধান করে ফেলতে পারতেন।

কাহিনী নং ৩৮১

নিজের গর্তে নিজে পতিত

খলীফা মনসুরের দ্বার রক্ষক রবি হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বড় শত্রু ছিল। একদিন খলীফার আহবানে ইমাম আযম খলীফার দরবারে গেলে রবি খলীফাকে বললো, আমীরুল মুমেনীন, এ আবু হানিফা আপনার দাদা হযরত ইবনে আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিরোধীতা করে। হযরত আব্বাস (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অভিমত ছিল যে কোন বিষয়ে শপথকারী ব্যক্তি যদি শপথের একদিন বা দুদিন পরেও ইনশা আল্লাহ বলে, তাহলে শপথ বলবৎ থাকবে না। আর এ আবু হানিফার অভিমত হচ্ছে শপথের সাথে সাথে ইনশাআল্লাহ বললে শপথের উপর প্রভাব পড়বে অর্থাৎ শপথ ভঙ্গ করলেও কিছু বলার থাকবে না। কিন্তু পরে ইনশা আল্লাহ বললে সেটা গ্রহণযোগ্য হবে না। ইমাম আযম সাথে সাথে খলীফাকে সম্বোধন করে বললেন 'আমীরুল মুমেনীন' রবি এটাই চাচ্ছে যে আপনার বাহিনীকে আপনার অনুগত্য থেকে আজাদ করে দিতে, যাতে সুযোগ বুঝে বিদ্রোহ করতে পারে। মনসুর বললেন, এটা কী করে হতে পারে? ইমাম আযম

বললেন, সৈন্যরা আপনার সামনে শপথ করে বলবে যে আপনার আনুগত্য করবে এবং ঘরে গিয়ে 'ইনশা আল্লাহ' বলে ফেলবে এবং আপনার আনুগত্য থেকে মুক্ত হয়ে যাবে। মনসুর এ কথা শুনে হেসে দিলেন এবং রবিকে বললেন, ইমাম আবু হানিফাকে কোন সময় ক্ষেপিও না। ইমাম আযম যখন দরবার থেকে বের হয়ে চলে যাচ্ছিলেন, রবি বললো, আজকেতো আপনি আমার গরদান উড়ায়ে দিয়েছিলেন। তিনি বললেন, সূচনাতো তুমিই করেছিলে।
(কিতাবুল আযকিয়া ১৪০ পৃঃ)

সবক ঃ আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর অনেক শত্রু ছিল। কিন্তু খোদা প্রদত্ত যোগ্যতা বলে কেউ তাঁকে পরাস্ত করতে পারে নি।

কাহিনী নং ৩৮২

আবুল আব্বাস তুসির জবাব

খলীফা আবু জাফর মনসুরের দরবারে ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর বিশেষ কদর ছিল। এ জন্য মনসুরের দরবারের লোকেরা তাঁর প্রতি খুবই আক্রোশ পোষণ করতো এবং ইমামকে ঘায়েল করার সুযোগের সন্ধানে থাকতো। এ ধরনের আক্রোশের বসবর্তী হয়ে এক দিন ইমামকে ঘায়েল করার উদ্দেশ্যে আবুল আব্বাস তুসি দরবারে ইমাম আযমকে প্রশ্ন করলো, আচ্ছা, যদি আমীরুল মুমেনীন আমাদের কাউকে নির্দেশ দিল যে অমুকের গরদান উড়ায়ে দাও। কিন্তু আমরা ওর অপরাধ সম্পর্কে কিছুই জানি না। এ রকম অবস্থায় আমাদের পক্ষে ওকে হত্যা করা কি জায়েয হবে? ইমাম আযম সঙ্গে সঙ্গে পাল্টা প্রশ্ন করলেন, আমি আপনার থেকে জানতে চই যে, আমীরুল মুমেনীন কি সঠিক নির্দেশ দেন, নাকি ভুল নির্দেশ দেন? তুসি বললো, আমীরুল মুমেনীন ভুল নির্দেশ কি করে দিতে পারে। ইমাম আযম বললেন, তাহলে সঠিক নির্দেশ কার্যকর করতে দ্বিধাবোধ কেন? বেচারা একেবারে লা-জবাব হয়ে গেল।

(খায়রুল হাসান- ১০১ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণের সাথে বিদ্বেষ পোষণকারীরা কোন সময় কামিয়াব হতে পারে না। ইমাম আযমের প্রতি বিদ্বেষ পোষণকারীরা ওনাকে নাজহাল করার জন্য অনেক চেষ্টা করেছে। কিন্তু ইমামের কোন ক্ষতি করতে পারে নি।

কাহিনী নং ৩৮৩

ময়ূর-চোর

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এক প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি হয়ে ছিল। সে ইমাম আযমের কাছে এ ঘটনা বললো। ইমাম আযম ওকে বললেন, তুমি এ কথা আর কাউকে বল না। ইমাম আযম মসজিদে গেলেন। যখন সব লোক নামাযের জন্য জামায়েত হলো, ইমাম দাঁড়িয়ে বললেন, বড় লজ্জার বিষয়, প্রতিবেশীর ময়ূর চুরি করে এমন অবস্থায় নামায পড়তে আসলো ওর মাথায় এখনও ময়ূরের পালক রয়েছে। এ কথা শুনা মাত্র এক ব্যক্তি স্বীয় মাথায় হাত দিল এবং মাথা লুকাতে চেষ্টা করলো। ইমাম আযম লোকটিকে বললেন, ওর ময়ূর তুমিই চুরি করেছ। লোকটি স্বীকার করলো এবং ময়ূরটি ফেরত দিয়ে দিল।

(আল-খায়রাতুল হাসান - ১০২ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম আযম দারুন বুদ্ধিমত্তার অধিকারী ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৮৪

আটা

হযরত আমশ (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) একজন বড় মুহাদ্দিস ছিলেন কিন্তু তাঁর মেজাজটা ছিল কড়া। একদিন ঘরের সওদা নিয়ে তাঁর স্ত্রীর সাথে কথা কাটা কাটির এক পর্যায়ে রাগের মাথায় বললেন, ঘরে আটা শেষ হয়ে যাবার কথা যদি আমাকে তোমার নিজ মুখে বল বা লিখে বল বা খবর দাও বা অন্য ব্যক্তির সাথে এ প্রসঙ্গে আলোচনা কর যেন আমাকে বলে বা এ ব্যাপারে ইংগিত কর, তাহলে তোমার উপর তিন তালাক পতিত হবে। এতে স্ত্রীতো মহা সমস্যায় পড়লেন। কোন একজন ওনাকে পরামর্শ দিল যে ইমাম আবু হানিফার কাছে গিয়ে এ ব্যাপারে অভিমত চাইলে হয়তো উনি কোন একটা সমাধান দিতে পারেন। সে মতে হযরত আমশের স্ত্রী ইমাম আযমের কাছে গেলেন এবং সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলেন। সব কিছু শুনে ইমাম আযম বললেন, যখন আটা রাখার চামড়ার থলিটা খালি হয়ে যাবে তখন থলিটা ওনার ঘুমন্ত অবস্থায় ওনার কাপড়ের সাথে বেঁধে দিবেন। ঘুম থেকে উঠে সেটা দেখে উনি বুঝতে পারবেন যে আটা শেষ হয়ে গেছে। উনি তাই

করলেন। হযরত আমশ ব্যাপারটা বুঝতে পারলেন এবং বললেন, 'এটা নিঃসন্দেহে আবু হানিফার পরামর্শে করা হয়েছে। যত দিন এ বেটা জীবিত আছেন, আমাদের রেহাই নেই। তাঁর জন্য আমাদেরকে মেয়েদের কাছে অপমানিত হতে হচ্ছে। ওদের সামনে আমাদের জ্ঞান বুদ্ধির দুর্বলতা প্রকাশ পাচ্ছে'। (জওয়াহেরুল বয়ান - ১০২ পৃঃ)

সবকঃ আমাদের ইমাম আযমের জ্ঞান গরিমা এবং ফিকহী দূরদর্শীতার সামনে বড় বড় মুহাদ্দিসগণ হার মানতে বাধ্য হন।

কাহিনী নং ৩৮৫

গ্লাসের পানি

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে এক ব্যক্তি স্ত্রীর কাছে এক গ্লাস পানি চাইল। স্ত্রী পানি আনতে একটু দেরী করায় সে রাগের মাথায় বললো, আমি এ পানি পান করবো না। তুমি নিজে পান করলেও তোমার উপর তালাক, অন্য কাউকে পান করালেও তালাক এবং এ পানি ফেলে দিলেও তোমার উপর তালাক পতিত হবে। বেচারী মহা সমস্যায় পড়ে গেল। মহিলার পরিচিত কোন এক ব্যক্তি এ ঘটনা ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে বর্ণনা করলে তিনি বললেন, এক্ষুনি গিয়ে ওকে বল যে কোন একটি শুকনো কাপড় গ্লাসের ভিতরে রাখে,যেন পানিগুলো শুষে নেয়। অতঃপর কাপড়টি রোদ্রে শুকায়ে ফেলবে। এভাবে করলে তালাক পতিত হবে না।

(খায়রাতুল হাসান - ১০৪ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ তায়ালা হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কে এমন এক বিশেষ বোধ শক্তি দান করেছেন যে তিনি নিমিষে এমন এমন জঠিল সমস্যার সমাধান দেন যেটার ব্যাপারে বড় বড় দার্শনিক হিম সিম খেয়ে যায়।

কাহিনী নং ৩৮৬

মুরগির ডিম

ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর যুগে এক ব্যক্তি শপথ করেছিল যে সে ডিম খাবে না। সে আর একটি শপথ করেছিল যে ওর বন্ধুর পকেটে যে জিনিস

আছে সেটা নিশ্চয় খাবে। বন্ধুর পটেকে ছিল একটি ডিম। এখন সে মহা সমস্যায় পড়ে গেল। কোন অবস্থায় শপথ রক্ষা যাচ্ছে না। শেষ পর্যন্ত ইমাম আযমের কাছে গেলেন। ইমাম আযম বললেন, এ ডিম ডিমে তা দানরত কোন মুরগীর নিচে রেখে দাও। যখন বাচ্চা ফুটাবে, তখন সে বাচ্চাটা সুপ বানিয়ে খেয়ে ফেল, শপথ ভঙ্গ হবে না।

(খায়রাতুল হাসান - ১০৯ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম আযমের প্রতিটি কথায় বুদ্ধিমত্ত্বার চাপ রয়েছে। তাঁর কথা ও কাজেই প্রমাণিত হয় যে, তিনি বাস্তবিকই ইমামে আযম।

কাহিনী নং ৩৮৭

ভ্রান্ত প্রপোগাণ্ডা

একবার হযরত ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) মদীনা শরীফ অবস্থান কালে হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) পৌত্র হযরত মুহাম্মদ বিন হাসন (রাদি আল্লাহু আনহু) এর খেদমতে হাজির হন। তিনি ইমাম আযমকে লক্ষ্য করে বললেন আপনি কি সেই ইমাম আবু হানিফা যার সম্পর্কে আমি শুনেছি যে তিনি নাকি স্বীয় কিয়াস দ্বারা আমার দাদা হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছের বিরোধীতা করেন? ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) বললেন, মাজাল্লা এটা কি করে হতে পারে। আপনি তশরীফ রাখুন, কারণ আপনি আউলাদে রসূল হিসেবে যথাযথ সম্মানের অধিকারী। হযরত মুহাম্মদ বিন হাসন তশরীফ রাখলে ইমাম আযম বললেন, বলুন, পুরুষ দুর্বল নাকি মহিলা দুর্বল? তিনি বললেন, মহিলা। পুনরায় জানতে চাইলেন, মহিলার অংশ কতটুকু? তিনি বললেন, পুরুষের অর্ধেক। ইমাম সাহেব বললেন, আমি যদি কিয়াস বা যুক্তিকে অগ্রাধিকার দিতাম, তাহলে এর বিপরীত হুকুম দিতাম এবং বলতাম যে পুরুষ যেহেতু শক্তিশালী ওর অংশ কম এবং মহিলার অংশ অধিক হওয়া উচিত। ইমাম আযম জিজ্ঞেস করলেন, নামায আফজল, নাকি রোযা? তিনি বললেন, নামায, পুরানায় জিজ্ঞেস করলেন, মহিলার ঋতুস্রাবের ফলে রোযা-নামায কাজা হলে, কাজা নামাজ পড়বে, নাকি কাজা রোযা রাখবে? তিনি বললেন, কাজা রোযা আদায় করবে। ইমাম আযম বললেন, আমি যদি কিয়াসকে প্রাধান্য দিতাম তাহলে ঋতুস্রাব থেকে পবিত্র হওয়ার পর কাজা

রোযা নয়, কাজা নামাজ আদায় করার নির্দেশ দিতাম। পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, প্রস্রাব নাপাক, নাকি বীর্য? তিনি বললেন, প্রস্রাব। ইমাম সাহেব বললেন, আমি যদি কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিতাম, তাহলে বীর্য নয়, প্রস্রাব বের হলে গোসল ওয়াজিব বলতাম। এ বক্তব্য শুনে ইমাম মুহাম্মদ (রাদি আল্লাহু আনহু) ইমাম আযমের কপালে চুমু দিলেন এবং বললেন আমি বুঝতে পেরেছি যে আপনার সম্পর্কে মিথ্যা প্রপোগাণ্ডা করা হয়েছে।

(জাওয়াহেরুল বয়ান-১০২ পৃঃ)

সবকঃ যারা বলে যে ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হাদীছের উপর কিয়াসকে অগ্রাধিকার দিয়ে থাকে, সেটা মিথ্যা প্রপোগাণ্ডা মাত্র। তিনি প্রতিটি মাসায়েল কুরআন হাদীছের আলোকেই পেশ করেছেন।

কাহিন নং ৩৮৮

দিনার ভর্তি থলি

এক ব্যক্তি মারা যাবার সময় ওর এক বন্ধুকে ডেকে এক হাজার দিনার ভর্তি একটি থলি ওকে সোপর্দ করলো এবং বললো, যখন আমার ছেলেটা বড় হবে তখন এ থলি থেকে তুমি যা পছন্দ কর ওকে দিয়া দিও। এ কথাটি বলে সে মারা গেল। ছেলে বড় হলে সে ওকে শুধু খালি থলিটা দিয়ে দিল এবং সেই এক হাজার দিনার নিজে রেখে দিল। ছেলেটি ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এর কাছে গিয়ে সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করলো। তিনি সেই লোকটাকে ডেকে বললেন, সেই এক হাজার দিনার ওকে ফেরত দিয়া দাও। কেননা ওর পিতা মারা যাবার সময় তোমাকে বলে ছিল- এ থলি থেকে যা তুমি পছন্দ কর ওকে দিও। এ থলি থেকে তুমি দিনারগুলো পছন্দ করেছ, যার কারণে তুমি রেখে দিয়েছ। তাই ওনার অসীয়ত মুতাবেক; তুমি যেটা পছন্দ করেছ সেটা ওকে দিয়া দাও। অতএব বাধ্য হয়ে সেই দিনারগুলো ছেলেকে ফেরত দিতে হলো।

(জাওয়াহেরুল বয়ান - ১০৮ পৃঃ)

সবকঃ এতীমের মাল আত্মসাৎ করা বড় গুনাহ। অসীয়ত যথাযথ মান্য করা উচিত।

কাহিনী নং ৩৮৯

এক বেদুইন ও ছাতু

একবার ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। পথে তাঁর পানির তৃষ্ণা লেগে ছিল। এক বেদুইনের হাতে পানির পাত্র দেখে তিনি ওর কাছে পানি চাইলেন। সে বিনামূল্যে পানি দিতে অস্বীকার করলো তবে পাঁচ দিরহামের বিনিময়ে পাত্রসহ দিয়ে দিতে রাজি হলো। অতএব ইমাম সাহেব পাঁচ দিরহাম দিয়ে পানিসহ পাত্রটি ক্রয় করে নিলেন। ইমাম সাহেবের কাছে রওগন ও যায়তুন মিশ্রিত মজাদার ছাতু ছিল। তিনি সেটা খাবার সময় ওকেও খেতে দিলেন। সে তৃপ্তি সহকারে পেটভরে খেল। এ ছাতু খাওয়ার পর ওর পানির তৃষ্ণা লাগলে ইমাম সাহেবের কাছে এক গ্লাস পানি চাইলো। ইমাম সাহেব বললেন, এক গ্লাস পানি পাঁচ দিরহামের কমে দেয়া যাবে না। ছাতু খাওয়ার ফলে বেচারার ভীষণ তৃষ্ণা লেগেছিল। তাই বাধ্য হয়ে পাঁচ দিরহাম দিয়ে এক গ্লাস পানি নিয়ে পান করলেন। আর ইমাম সাহেব দিরহামও ফেরত পেলেন এবং পানিও পেয়ে গেলেন। (কিতাবুল আজকিয়া ১৩১ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ তাআলা যাকে ইলম ও হেকমত দান করেছেন তিনি এর বলে অতি সহজে অনেক সমস্যার সমাধান করে ফেলেন।

কাহিনী নং ৩৯০

এক খারেজীকে কোনঠাসাকরণ

খারেজীদের গোলমালের সময় অন্যদের সাথে ইমাম আযমও গ্রেপ্তার হয়ে ছিলেন এবং তাঁকে খারেজীদের নেতা জাহাকের সামনে নিয়ে যায়। জাহাক স্বীয় নীতি মুতাবেক ইমাম আযমকে তওবা করার জন্য বললো। ইমাম আযম বললেন أَنَا تَائِبٌ مِنْ كُلِّ كُفْرٍ (আমি যাবতীয় কুফরী থেকে তওবাকারী) এটা শুনে জাহাক তাঁকে ছেড়ে দিল। কিন্তু কোন এক কুচক্রি ব্যক্তি যাহাককে বুঝালো যে আবু হানিফার মতে আপনাদের আকীদাসমূহ কুফরী। তিনি সেই কুফরী থেকে তওবা করেছেন। এ কথা শুনে ইমাম আযমকে পুনরায় গ্রেপ্তার করায়ে আনা হলো,

এবং জিজ্ঞেস করলো, জনাব, আমি শুনলাম যে আপনি যে কুফরী থেকে তওবা করেছেন সেটা আমাদের আকিদার ব্যাপারে করেছেন। অর্থাৎ আপনি আমাদের আকিদাকে কুফরী মনে করেন। খারেজীরা কেবল কুরআন মজিদের নির্দেশকে মান্য করতো এবং ওদের আকীদা ছিল যে সব কিছু বাদ দিয়ে কেবল কুরআনের ফায়সালা তলব করা উচিত। ইমাম আযম যখন অবস্থা বেগতিক দেখলেন এবং বুঝতে পারলেন যে এ মূর্খরা তাঁকে সহজে ছাড়বে না এবং কুরআন ছাড়া অন্য কিছু মানবে না, তখন তিনি জাহাককে বললেন, আপনি আমার ব্যাপারে যা কিছু বললেন, সেটা কি কেবল ধারণা বা অনুমান ভিত্তিক, নাকি বাস্তব কোন প্রমাণ আছে? জাহাক বললো, কেবল অনুমান এবং ধারণা করে বলছি। ইমাম আযম তাৎক্ষনিক কুরআনের এ আয়াত তেলাওয়াত করলেন بَعْضَ الظَّنِّ اِثْمٌ অর্থাৎ কতেক ধারণা গুনাহ এবং গুনাহ করাকে আপনারা কুফরী মনে করেন। অতএব এ গুনাহের জন্য আপনার তওবা করা প্রয়োজন। খারেজীদের নেতা জাহাক এটা শুনে বললো, ঠিকই বলেছেন, আমি তওবা করতেছি।

সবকঃ আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) এমন জ্ঞানের অধিকারী ছিলেন যে, বাতিল পন্থীরা তাঁর সাথে কিছুতেই ঠিকে উঠতে পারতো না। অবশ্য বাতিলেরা তাঁকে অনেক জ্বালাতন করেছিল।

কাহিনী নং ৩৯১

আপেলের রহস্য

এক দিন ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) তার অনুসারীদের সাথে মসজিদে বসা ছিলেন। এমন সময় এক মহিলা মসজিদে প্রবেশ করলো। ওর হাতে একটি আপেল ছিল। আপেলটির এক অংশ লাল এবং অপর অংশ খয়েরী ছিল। মহিলা আপেলটি ইমাম আযমের সামনে রাখলো এবং মুখে কিছু বললো না। ইমাম আযম আপেলটি ফেটে দু'টুকরা করে মহিলাকে দিয়ে দিলেন। মহিলা সেটা নিয়ে চলে গেল। উপস্থিত যারা ছিল তারা এর রহস্য কিছুই বুঝলো না। তারা ইমাম আযমের কাছে এর রহস্য জানতে চাইলো। তিনি বললেন, মহিলাটি আমার কাছে একটি মাসআলা জিজ্ঞেস করলো, আমি এর উত্তর দিলাম। তারা আরও আশ্চর্য হয়ে জিজ্ঞেস করলো, কি মাসআলা জিজ্ঞেস করেছিল? ইমাম আযম বললেন,

মহিলাটি আমার সামনে আপেল রেখে এটাই জানতে চেয়েছিল যে ওর ঋতুস্রাব কালে রক্তের রং কোন সময় আপেলের এক অংশের মত লাল এবং কোন সময় আপেলের অন্য অংশের মত খয়েরী হয়ে থাকে। উভয় প্রকারের রক্ত ঋতুস্রাবের অন্তর্ভুক্ত কিনা। আমি আপেলকে ফেটে ওকে এ জবাব দিয়েছি যে যতক্ষণ পর্যন্ত আপেলের ভিতরের অংশের মত রক্তের রং একেবারে সাদা হবে না, ততক্ষণ সেই রক্ত ঋতুস্রাব হিসেবে গন্য হবে।

(রাউজুল ফায়েক - ১১৯ পৃঃ)

সবকঃ আগের যুগের মহিলারা মাসলা-মাসায়েল সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখতো এবং প্রয়োজন বোধে অন্যদের থেকে জেনে নিত। কিন্তু আজকালকার অধিকাংশ মহিলা প্রয়োজনীয় মাসআলা সম্পর্কে অজ্ঞ এবং প্রয়োজনবোধও করে না।

কাহিনী নং ৩৯২

হাশরের ময়দান

হযরত নওফল বিন হায়ান (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ইন্তেকালের পর আমি এক রাতে স্বপ্ন দেখলাম যে কেয়ামতের ময়দানে সমস্ত মখলুক হিসেব নিকেশের জন্য নির্ধারিত স্থানে দাঁড়িয়ে আছে। আমি আরও দেখলাম যে হুযূর সরওয়ারে আলম (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) হাউজে কাউসারে তশরীফ রেখেছেন। তাঁর ডানে-বামে নুরানী লোক দাঁড়িয়ে আছেন। আমি নুরানী আকৃতির এমন এক বৃদ্ধ ব্যক্তিকে দেখলাম যার দাড়ি ও চুল সাদা ছিল এবং হুযূরের ডান দিকে দাঁড়ানো ছিল। ইমাম আবু হানিফা (রাদি আল্লাহু আনহু) কেও হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর কাছে দাঁড়ানো দেখলাম। আমি ইমাম সাহেবের কাছে গিয়ে সালাম আরয করে বললাম, আমাকে পানি প্রদান করুন। হযরত ইমাম আযম বললেন, হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) যতক্ষণ অনুমতি দিবেন না, ততক্ষণ দিতে পারবো না। এ কথা শুনে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ফরমালেন, ওকে পানি দাও। অতঃপর ইমাম সাহেব আমাকে এক গ্লাস পানি দিলেন এবং আমি পান করলাম। এরপর আমি ইমাম সাহেবের কাছে হুযূরের ডান পাশে দাঁড়ানো নূরানী চেহারার অধিকারী বয়স্ক লোকটি সম্পর্কে জানতে চাইলাম। ইমাম সাহেব বললেন, উনি হযরত ইব্রাহীম

খলীলুল্লাহ এবং বাম পাশের ব্যক্তিটা হচ্ছেন হযরত ছিদ্দিকে আকবর (রাদি আল্লাহু আনহু) এভাবে আমি এক এক জন সম্পর্কে জিজ্ঞেস করতে লাগলাম এবং ইমাম সাহেব জবাব দিতে রইলেন।

(তাজকিরাতুল আউলিয়া ২৫৩ পৃঃ)

সবকঃ ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) ছিলেন হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর নৈকট্য প্রাপ্ত ব্যক্তিদের অন্যতম। উপরোক্ত স্বপ্নে এটাই প্রকাশ পায় যে আমাদের ইমাম আযম (রাদি আল্লাহু আনহু) হাদীছের পূর্ণ অনুসারী ছিলেন।

কাহিনী নং ৩৯৩

ইমাম শাফেয়ী (রাদি আল্লাহু আনহু) এর স্বপ্ন

হযরত ইমাম শায়েঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, শৈশব কালে আমি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) কে স্বপ্নে দেখেছিলাম। হুযূর আমাকে বলছিলেন, হে বালক, তুমি কেঃ আমি আরয করলাম, ইয়া রাসূলল্লাহ! আমি আপনার উম্মত। হুযূর বললেন, কাছে এসো। আমি কাছে গেলে, হুযূর স্বীয় মুখ মুবারক থেকে থুথু মুবারক আমার মুখে নিক্ষেপ করলেন। অতঃপর বললেন, এবার যাও, আল্লাহ তাআলা তোমাকে ফজীলত ও বরকত দান করুক। এর পর পরই হযরত আলী (রাদি আল্লাহু আনহু) তশরীফ আনলেন এবং তাঁর আংটি স্বীয় আঙ্গুল থেকে খুলে আমার আঙ্গুলে পরায়ে দিলেন।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া-২৫৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর শান অনেক উচ্চ। তিনি হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর থু থু মুবারক এবং হযরত আলী মরতুজা (রাদি আল্লাহু আনহু) এর আংটির বরকতে জ্ঞান ও ফজীলতের সূর্য হয়ে উদিত হয়ে ছিলেন এবং মুসলমানদের ইমাম হওয়ার সন্মান লাভ করেন।

কাহিনী নং ৩৯৪

মেধাবী শিশু

হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর তখন বয়স হয়েছিল ছয় বছর, মাদ্রাসায় আসা যাওয়া করছেন। তাঁর মা ছিলেন হাশেমী বংশীয় এক নেককার

পরহিজগার মহিলা। লোকেরা ওনার কাছে টাকা-পয়সা, জিনিস-পত্র আমানত রাখতেন। একদিন দু'ব্যক্তি এসে তাঁর কাছে একটি সিন্ধুক আমানত রেখে চলে গেল। কয়েকদিন পর ওদের একজন এসে সিন্ধুকটি চাইলে তিনি দিয়া দেন। এর কয়েক দিন পর অপরজন এসে সিন্ধুকটি চাইলো। তিনি বললেন, তোমার সাথী এসে সেটা নিয়ে গেছে। সে বললো এ রকমতো দেয়ার কথা ছিল না। আমরা আপনাকে বলেছিলাম যে আমরা উভয়ে এক সাথে না আসলে সিন্ধুক যেন দেয়া না হয়। তিনি বললেন, ঠিকই, তোমরা তা বলেছিলে, এখন কি করি। তিনি মহা চিন্তায় পড়ে গেলেন। হযরত ইমাম শাফেঈ মাদ্রাসা থেকে এসে তাঁর মাকে চিন্তিত ও মর্ম্মাহত দেখে জিজ্ঞেস করলেন, আম্মা আপনি এত চিন্তিত কেন? মা ছেলেকে ঘটনাটি শুনালেন। ছেলে ঘটনা শুনে বললেন, চিন্তার কিছু নেই, এর ব্যবস্থা আমি করবো। লোকটিকে আমাকে দেখায়ে দেন, আমি ওর সাথে কথা বলবো। লোকটি সামনেই ছিল এবং বললো, বান্দা হাজির। হযরত ইমাম শাফেঈ ওকে বললেন, আপনাদের সিন্ধুক মওজুদ আছে। আপনি আপনার সাথীকে নিয়ে আসেন যেন আপনাদের কথামত উভয়কে এক সাথে হস্তান্তর করতে পারি। লোকটি এ কথা শুনে হতভম্ব হয়ে গেল এবং লা-জবাব হয়ে চলে গেল।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৫৫ পৃঃ)

সবকঃ হযরত শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) শৈশব কাল থেকেই খুবই বুদ্ধিমান এবং জ্ঞান গরিমার অধিকারী ছিলেন। পরবর্তীতে ইমামুল মুসলেমীন হয়ে সেই জ্ঞান গরিমার প্রতিফলন ঘটান।

কাহিনী নং ৩৯৫

বাদশাহ হারুনুর রশীদের সিংহাসনে

এক রাত্রে বাদশাহ হারুনুর রশীদ ও তাঁর স্ত্রী জোবেদা খানমের মধ্যে কিছু কথা কাটাকাটি হয়েছিল। এক পর্য্যায়ে জোবেদার মুখ থেকে বের হলো-'হে দোযখী! হারুনুর রশীদ এটা শুনে বললেন,'আমি দোযখী হলে, তোমাকে তালাক'। এরপর একে অপর থেকে আলাদা হয়ে গেল। কিন্তু বাদশাহ হারুনুর রশীদ যেহেতু জোবেদাকে খুবই ভালবাসতেন, তাই ওর বিরহে অস্থির হয়ে গেলেন। দেশের বড় বড় ওলামায়ে কিরামকে ডেকে এ বিষয়ে ফতওয়া চাইলেন। কিন্তু কেউ

গ্রহণযোগ্য উত্তর দিতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত বাদশাহের দরবারে বৈঠক করে সবাই একমত হয়ে ঘোষণা করেন যে হারুনুর রশীদ দোযখী, না বেহস্তী, সেটা একমাত্র আল্লাহ তাআলাই জানেন। তাই ওনার স্ত্রী তালাক প্রাপ্ত হয়েছে কি না নিশ্চিত করে বলা যাবে না। এ সিদ্ধান্তের পর ওলামায়ে কিরামের বৈঠকে অবস্থান রত একটি বালক দাঁড়িয়ে বললো, যদি অনুমতি দেয়া হয় আমি এর সন্তোষজনক জবাব দিব। সবাই ওর দিকে কৌতূহলী দৃষ্টিতে তাকালেন। কারণ যেখানে বড় বড় আলেমগণ এ মাসআলার জবাব দিতে অপারগ হয়েছে সেখানে এ ছেলে কি জবাব দিবে। বাদশাহ ওকে সামনে ডেকে নিলেন এবং বললেন, তুমি জবাব দাও। ছেলেছি বললো, আপনার কি আমার প্রয়োজন, নাকি আমার আপনার প্রয়োজন? হারুনুর রশীদ বললেন, আমার তোমার প্রয়োজন। এই উত্তর শুনে ছেলেটি বললো, তাহলে আপনি সিংহাসন থেকে নেমে আসুন এবং আমাকে সিংহাসনে বসে জবাব দেয়ার সুযোগ দিন। কারণ ওলামায়ে কিরামের মর্যাদা অনেক উর্ধে। অগত্যা হারুনুর রশীদ এতে সম্মতি জ্ঞাপন করে সিংহাসন থেকে নেমে আসলেন এবং ছেলেটি গিয়ে সিংহাসনে বসলেন। আরাম করে বসার পর হারুনুর রশীদকে সম্বোধন করে বললো, প্রথমে আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। আপনি কি কোন সময় কোন গুনাহ থেকে, যেটা করার সামর্থ রাখার পরও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে বিরত ছিলেন? হারুনুর রশীদ বললেন, হ্যাঁ,খোদার কসম, আমি সামর্থ রাখার পরও একমাত্র আল্লাহর ভয়ে গুনাহ থেকে বিরত রয়েছি। এ উত্তর শুনে ছেলেটি বললো আমি ফত্ওয়া দিচ্ছি যে আপনি দোযখী নন বরং বেহেস্তবাসীর অন্তর্ভূক্ত। উপস্থিত ওলামায়ে কেরাম চেঁচিয়ে উঠে বললেন, কোন্ দলীলের ভিত্তিতে? ছেলেটি বললেন, আল্লাহ তাআলা কালামে পাক ইরশাদ ফরমায়েছেন-

وَاَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهٖ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوٰى فَاِنَّ الْجَنَّةَ هِىَ الْمَاْوٰى

অর্থাৎ যে ব্যক্তি পাপ কাজের মনস্থ করলো, পরবর্তীতে খোদার ভয়ে বিরত রইলো, সে ব্যক্তির ঠিকানা জান্নাত। এ আয়াত শুনে উপস্থিত ওলামায়ে কিরাম বাহ! বাহ! করে উঠলেন এবং বলাবলী করতে লাগলেন যে, যে ছেলে শৈশবে এ রকম বোধ শক্তির অধিকারী, আল্লাহ জানেন বড় হলে এ ছেলে কোন্ পর্যায়ের আলেম হবে। জানেন, এ ছেলেটা কে ছিল? হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু

আনহু) ছিলেন এ বাহাদুর ছেলে।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৫৬ পৃঃ)

সবকঃ যারা বড় হয়ে জ্ঞানে গুনে জাতির শিরোমনি হয়ে থাকেন, তাঁদের শৈশবকালে তাঁদের সেই প্রতিভা প্রকাশ পায়। ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) এর জলন্ত উদহারণ।

কাহিনী নং ৩৯৬

পাদরী

রোমের বাদশাহ ছিল খ্রীষ্টান। প্রতি বছর বাদশাহ হারুনুর রশীদের কাছে কিছু হাদিয়া পাঠাতো। সে এক বছর ফন্দি করে কয়েক জন পাদরী পাঠালো এবং হারুনুর রশীদের কাছে এ খবর দিল যে; যদি হারুনুর রশীদের আলেমগণ আমার পাদরীদের সাথে মুনাজেরায় (ধর্মীয় বিতর্ক) বিজয়ী হতে পারে তাহলে হাদিয়া প্রেরণ বলবৎ থাকবে, অন্যথায় বন্ধ করে দেয়া হবে। পাদরীগণ যখন হারুনুর রশীদের কাছে পৌছলো তখন তিনি দজলা নদীর পাড়ে বিতর্কের স্থান নির্ধারণ করলেন। আলেমগণকে তথায় একত্রিত করলেন এবং রোম থেকে আগত পাদরীদেরকে তথায় ডেকে নিয়ে গেলেন। এর মধ্যে ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু)ও তথায় পৌছে গেলেন। বাদশাহ হারুনুর রশীদ একান্ত আগ্রহ প্রকাশ করলেন যে ইমাম শাফেঈ যেন ওদের সাথে মুনাজেরা করেন। ইমাম শাফেঈ বাদশাহের আগ্রহে সাড়া দিয়ে নিজের কাধেঁ রক্ষিত জায়নামাযটি নিয়ে দজলা নদীর পানির উপর বিছায়ে সেটার উপর তিনি বসলেন এবং বললেন, যে ব্যক্তি আমার সাথে মুনাজেরা করতে ইচ্ছুক, সে যেন এখানে এসে আমার সাথে মুনাজেরা করে। পাদরীরা এ অবস্থা দেখে হতবাক হয়ে গেল এবং সবাই মুসলমান হয়ে গেল। রোমের বাদশাহ যখন এ খবর পেল যে সমস্ত পাদরী ইমাম শাফেঈ এর হাতে মুসলমান হয়ে গেছে, তখন সে বললো, আল্লাহর শোকর যে সেই ইমাম এখানে আসে নাই। আমার মনে হয় এখানে আসলে সমগ্র রোমবাসী মুসলমান হয়ে যেত।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৫৮ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহ ওয়ালাগনের শান অনেক উচ্চ। আগুন-পানি মাটি-বাতাস ওনাদের আজ্ঞাবহ।

কাহিন নং ৩৯৭

অন্তর্দৃষ্টি

একবার হযরত ইমাম শাফেঈ এবং হযরত ইমাম আহমদ (রাদি আল্লাহু আনহুমা) জামে মসজিদে বসে ছিলেন। তখন একজন লোক এসে নামায পড়ছিলেন। ইমাম আহমদ লোকটিকে দেখে বললেন, এ ব্যক্তি সম্ভবতঃ কামার। ইমাম শাফেঈ বললেন, আমার মনে হয় সে কাঠমিস্ত্রী। লোকটি নামায থেকে ফারেগ হলে ওকে জিজ্ঞেস করা হলো যে সে কি কাজ করে। লোকটি বললো, আমি গত বছর লোহার কাজ করতাম, এখন কাঠের কাজ করি।

(নজহাতুল মাজালিস- ১১৭ পৃঃ ১ জিঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণের মুখ থেকে যেটা বের হয় সেটা সত্য হয়ে থাকে।

কাহিনী নং ৩৯৮

নবীগণের উত্তরাধিকারী

হযরত রবী নামে এক বুজুর্গ এক রাতে স্বপ্ন দেখলেন যে হযরত আদম (আলাইহিস সালাম) ইন্তেকাল করেছেন, লোকেরা তাঁর জানাযা মুবারক কাঁধে করে নিয়ে যাচ্ছেন। হযরত রবী এ স্বপ্ন দেখে জেগে উঠলেন এবং সকালে এক স্বপ্ন বিশারদের কাছে এর তাবীর জিজ্ঞেস করলেন। উনি বললেন, বর্তমান যুগের যিনি বড় আলেম, তিনি মারা যাবেন। কেননা وَعَلَّمَ اٰدَمَ الْاَسْمَاءَ كُلَّهَا (অর্থাৎ আদম (আলাইহিস সালাম) কে সব কিছুর নাম শিখানো হয়েছে। এ আয়াত অনুসারে জ্ঞান-আদম (আলাইহিস সালাম) এর বিশেষ বৈশিষ্ট্য। ঠিকই এর কিছু দিন পর হযরত ইমাম শাফেঈ ইন্তেকাল করেন।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৫৯ পৃঃ)

সবকঃ দীনের ইমামগণ নবীগণের উত্তরাধিকারী হয়ে থাকেন এবং তাঁরা নবীগণ থেকে ফয়েজ-বরকত লাভ করে থাকেন।

কাহিনী নং ৩৯৯

ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু)

বাগদাদ শহরে যখন মোতাযালা ফেরকা প্রাধান্য বিস্তার করলো তখন তারা হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বলের মুখে জোর পুর্বক কুরআনকে মখলুক বলাতে চাইলো। তারা নানা ষড়যন্ত্র করে তাঁকে খলীফার দরবারে নিয়ে গেল। দরবারের প্রবেশ পথে এক দারোয়ান দাঁড়ানো ছিল। সে ইমাম সাহেবকে দেখে বললো, আপনি কক্ষনো কুরআনকে মখলুক বলবেন না, বীর পুরুষের মত অটল থাকবেন। দেখুন, আমি একবার চুরির অপরাধে বন্দী হয়ে ছিলাম। আমাকে হাজার বেত্রাঘাত করা হয়েছিল। আমি স্বীকার করিনি, অস্বীকারে অটল ছিলাম। শেষ পর্যন্ত আমি মুক্তি পেয়েছিলেম। দেখুন, আমিতো হকের উপর ছিলাম না। ধৈর্যের বদৌলতে রেহাই পেয়েছি। আপনি সুস্পষ্ট হকের উপর রয়ে ধৈর্যের দ্বারা কেন কামিয়াব হবেন না? হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল ওর এ কথায় খুবই প্রভাবান্বিত হলেন এবং বললেন আল্লাহ তোমাকে যজায়ে খায়ের দান করুক। আমি তোমার এ পরামর্শ খুবই ভালমতে স্মরণ রাখবো এবং হককে কক্ষনো ত্যাগ করবো না। দরবারে প্রবেশ করার পর কুরআনকে মুখলুক বলার জন্য তাঁর উপর চাপ সৃষ্টি করলো কিন্তু তিনি কিছুতেই মখলুক বললেন না। শেষ পর্যন্ত তাঁর হাত-পা বেঁধে বেত্রাঘাত করা হলো কিন্তু তিনি কিছুতেই কুরআন মখলুক বললেন না। সেই বন্দী অবস্থায় এক পর্য্যায়ে তাঁর কাপড় খুলে গিয়েছিল। উভয় হাত বন্ধ থাকায় তিনি কিছুই করতে পারছিলেন না। সবাই দেখলো যে অদৃশ্য থেকে দু'টি হাত আভির্ভূত হয়ে ওনার পরিধানের কাপড় বেঁধে দিল। তাঁর এ কেরামত দেখে তাঁকে ছেড়ে দিল।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৬১ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) মুসলমানদের ইমাম ও হকের ঝান্ডাবাহী ছিলেন। শত্রুরা তাঁর প্রতি সীমাহীন অত্যাচার করেছে। তিনি ধৈর্যধারন করেছেন এবং হকের উপর অটল রয়েছেন। কুরআন-হাদীসের ইজ্জতের খাতিরে যে কোন ত্যাগ স্বীকার করতে বদ্ধপরিকর ছিলেন।

কাহিনী নং ৪০০

তাজীম ও প্রতিদান

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) একবার এক নদীর কিনারায় বসে অযু করছিলেন এবং অপর ব্যক্তি তাঁর থেকে উপর দিকে বসে অযু করছিলেন। লোকটি যখন ইমাম সাহেবকে অযু করতে দেখলো, তখন ওনার সম্মানে তাড়াতাড়ি ওখান থেকে উঠে নিচে নেমে আসলো এবং তাঁর থেকে আরও নিচের দিকে গিয়ে অযু করলো। ঐ ব্যক্তি মারা গেলে কোন এক নেক বান্দা ওকে স্বপ্ন দেখলো এবং জিজ্ঞেস করলো, আল্লাহ তায়ালা তোমার সাথে কেমন আচরণ করেছেন? এর উত্তরে সে বললো, ইমাম আহমদ বিন হাম্বল অযু করার সময় আমি ওনার প্রতি যে সম্মান দেখায়েছিলাম আল্লাহ তাআলা সেই সম্মানের প্রতিদানে আমার প্রতি বড় মেহেরবানী করেছেন এবং আমাকে নাজাত দিয়েছেন।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া- ২৬২ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহওয়ালাগণের প্রতি তাজীমের দ্বারা আল্লাহ তাআলা সন্তুষ্ট হন। অতএব ওনাদের প্রতি যথাযত সম্মান প্রদর্শন করা উচিত।

কাহিনী নং ৪০১

জ্ঞান ও আমল

একবার হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ঘরে তাঁর এক ছাত্র এসেছিল। তিনি রাত্রে ওর শোবার ঘরের পাশে এক বদনা পানি রাখলেন। সকালে তিনি দেখলেন যে সে বদনার পানি মোটেই খরচ করেনি। তিনি ওকে জিজ্ঞেস করলো, কি ব্যাপার তুমি বদনার পানি যে মোটেই খরচ করনি? সে বললো, হুযূর, আমি সেই পানি দিয়ে কি করতাম? তিনি বললেন, আমিতো তোমাকে সেই পানি অযু করার জন্য দিয়েছিলাম যেন রাত্রে নফল নামায পড়তে পার। যদি আমল না কর, এ জ্ঞান অর্জন করে লাভ কি?

(তাজকিরাতুল আউলীয়া- ৩৬৪ পৃঃ)

সবকঃ জ্ঞান অর্জন করার পর যদি সে অনুযায়ী আমল করা না হয় তাহলে সেই জ্ঞানের কোন মূল্য নেই।

কাহিনী নং ৪০২

খামিরা আটার রুটি

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর ছেলে হযরত ছালেহ ইস্পাহান শহরের বিচারক ছিলেন। তিনি প্রতিদিন রোযা রাখতেন এবং প্রতি রাত নফল নামাযে অতিবাহিত করতেন। একদিন ইমাম আহমদের খাদেম তাঁর ছেলের সেখান থেকে খামীর এনে তাঁর জন্য খমিরা রুটি তৈরী করলো। যখন তাঁর সামনে সেই রুটি নিয়ে গেল, তখন তিনি জিজ্ঞেস করলেন রুটি এ রকম তুল তুলে হয়েছে কেন, এর সাথে কি মিশানো হয়েছে? খাদেম বললো, হুযূর আপনার ছেলের পাকঘর থেকে খামীর নিয়ে আটার সাথে মিশায়েছি। তিনি বললেন সে তো ইস্পাহানের বিচারক, এ রুটি আমার খাবার উপযোগী নয়। তুমি এ রুটি কোন ভিক্ষুককে দিয়ে দাও এবং দেয়ার সময় এটা বল দিও যে এ রুটিতে সালেহের ঘরের খামীর মিশানো আছে এবং আটা আহমদ বিন হাম্বলের। ওর ইচ্ছে হলে নিতে পারে।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৬৩ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহর নেকবান্দাগণ বড় মুত্তাকী ও পরহিজগার হয়ে থাকেন। অতি নগন্য সন্দেহ পরায়ন বিষয় থেকেও বিরত থাকতেন। অথচ আজ আমরা হালাল-হারামের কোন পরওয়া করি না, যা পাই তা খেয়ে ফেলি।

কাহিনী নং ৪০৩

স্বর্ণের পাহাড়

একবার হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) এক অরণ্য পথ দিয়ে যাচ্ছিল। কিছু দূর গিয়ে রাস্তা হারিয়ে ফেলেছিলেন। অনতি দূরে এক কিনারায় এক লোককে বসা অবস্থায় দেখে ওর কাছে রাস্তা জিজ্ঞেস করার মনস্থ করলেন এবং ওর দিকে এগিয়ে গেলেন। লোকটি ইমামকে দেখে কাঁদতে লাগলো। ইমাম সাহেব লোকটিকে ক্ষুধার্ত মনে করে তাঁর থেকে সামান্য রুটি দিতে চাইলেন। এতে লোকটি খুব রেগে গেল এবং বলতে লাগলো, হে আহমদ বিন হাম্বল! আমার ও আল্লাহর মধ্যে হস্তক্ষেপ করার তুমি কে? তুমি কি খোদার কাজ সমূহে সন্তুষ্ট নও? এ জন্যইতো রাস্তা ভুলে যাচ্ছ। হযরত ইমাম আহমদ ওনার কথার দ্বারা খুবই

প্রভাবান্বিত হলেন এবং মনে মনে বললেন, হে আল্লাহ! বিভিন্ন এলাকায় তোমার এমন এমন বান্দাও আত্মগোপন করে রয়েছে। লোকটি বললো, হে আহমদ বিন হাম্বল, কি চিন্তা করতেছ। সে আল্লাহ পাকের এমন এমন বান্দাও আছে তাঁরা যদি আল্লাহকে শপথ দিয়ে কামনা করে, তাহলে সমগ্র ভূমি ও পাহাড় ওনাদের জন্য স্বর্ণে পরিণত হবে। হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল এরপর যে দিকে থাকালেন, সে দিকে দেখতে পেলেন স্বর্ণ ভূমি ও স্বর্ণ পাহাড়। এরই মধ্যে তিনি এ অদৃশ্য আওয়াজটি শুনতে পেলেন- হে আহমদ! লোকটি আমার এমন মকবুল বান্দা, সে যদি ইচ্ছে করে আমি ওর খাতিরে আসমান জমীন উলট-পালট করে দিতে রাজি।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৬২ পৃঃ)

সবকঃ আল্লাহর মকবুল বান্দাদের এমন শান হয়ে থাকে যে ওনারা মনের গোপন কথা জেনে পেলেন। ওনাদের মুখের ইশারায় ভূমি-পাহাড় স্বর্ণের হয়ে যায়। ওনারা ইচ্ছে করলে আল্লাহ তাআলা আসমান-জমীন উলট পালট করে দিতে রাজি। এ থেকে এটা সহজে অনুমেয় যে আল্লাহর সবচে প্রিয় বান্দা হুযুর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর চাওয়ার দ্বারা কিনা হতে পারে?

কাহিনী নং ৪০৪

ইবনে খযিমার স্বপ্ন

হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) এর এন্তেকালের পর বিশিষ্ট বুজুর্গ হযরত মুহাম্মদ ইবনে খযিমা (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) স্বপ্ন দেখেন যে ইমাম আহমদ বিন হাম্বল কোন এক জায়গায় যাচ্ছিলেন। তিনি ওনাকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনি কোথায় যাচ্ছেন? হযরত আহমদ বিন হাম্বল বললেন, দারুস সালাম যাচ্ছি। তিনি পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন, আল্লাহ তাআলা আপনার সাথে কি ধরনের আচরণ করেছেন? ইমাম আহমদ বললেন, আল্লাহ তাআলা আমাকে ক্ষমা করে দিয়েছেন, আমার মাথার উপর তাজ স্থাপন করেছেন এবং পাদুকা পরিধান করায়েছেন। আল্লাহ তাআলা আমাকে বলেছেন হে আহমদ, তোমাকে এ সব পুরস্কার প্রদান করার কারণ হলো যে তুমি কুরআনকে মখলুক বলনি।

(তাজকিরাতুল আউলীয়া ২৬৭ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম আহমদ বিন হাম্বল (রাদি আল্লাহু আনহু) তাঁর জ্ঞান,

ফজিলত ও আমল দ্বারা আল্লাহ তাআলার রেজামন্দি অর্জন করেছেন। যে কেউ হালেছ নিয়তে আল্লাহর কাজ করলে নিশ্চয় আল্লাহর রেজামন্দি লাভ করবে।

কাহিনী নং ৪০৫

হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু)

হযরত মুহাম্মদ ইবনে আবিস সুরা আসকালানী (রাহমাতুল্লাহে আলাইহে) স্বপ্নে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর দীদার লাভ করেন। তিনি হুযূরের কাছে আরয করেন, ইয়া রাসুলল্লাহ, কিছু ইরশাদ করুন, যেন আমি আপনার পক্ষে সেটা প্রচার করতে পারি। হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) ইরশাদ ফরমান, হে আসকালানী,আমি মালেক বিন আনসকে একটি জ্ঞানভাণ্ডার দান করেছি, যেটা সে তোমাদের মধ্যে বন্টন করতেছে। সেই জ্ঞানভাণ্ডার হলো মুতা গ্রন্থ।
(রওজুল ফায়েক ১৪৮ পৃঃ)

সবকঃ হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) মুসলমানদের ইমাম ছিলেন। মুতায়ে ইমাম মালেক এমন এক নির্ভযোগ্য হাদীছ গ্রন্থ,যেটাকে হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) স্বীয় জ্ঞানভাণ্ডার বলেছেন।

কাহিনী নং ৪০৬

জ্ঞানের কদর

বাদশাহ হারুনুর রশীদ একবার মদীনা মনোয়ারা গিয়ে জানতে পারলেন যে সেখানে ইমাম মালেক মুতার দরস (শিক্ষা) দেন। হারুনুর রশীদ ইমাম মালেকের কাছে খবর পাঠালেন যে, তিনি যেন মুতা গ্রন্থটি নিয়ে তাঁর কাছে আসেন এবং তাঁকে মুতা থেকে পড়ে শুনান। হযরত ইমাম মালেক এর উত্তরে বললেন যে হারুনুর রশীদকে যেন বলা হয়, জ্ঞান কারো কাছে যায় না বরং জ্ঞানের সন্ধানী জ্ঞানের কাছে আসে। হারুনুর রশীদ এটা শুনে নিজেই ইমাম মালেকের খেদমতে হাজির হলেন। হযরত ইমাম মালেক ওনাকে তাঁর পাশে আসনে বসালেন। হারুনুর রশীদ আরয করলেন এখন আপনি মুতা পাঠ করুন এবং আমি শুনি। হযরত ইমাম মালেক বললেন, আমিতো আজ পর্যন্ত কাউকে পড়ে শুনাইনি। বরং লোকেরা পড়ে এবং আমি শুনি। হারুনুর রশীদ বললেন, তাহলে সবাইকে বের করে দিন, আমি

নির্জন অবস্থায় পড়বো। ইমাম মালেক বললেন জ্ঞানকে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের খাতিরে সাধারণ লোকদেরকে বাঁধা দেয়া হলে বিশিষ্টজনের কোন উপকার হয়না। কি আর করা, হারুনুর রশীদ মূতা নিয়ে পড়তে শুরু করলেন। ইমাম মালেক ওনাকে বাঁধা দিয়ে বললেন, জ্ঞান অর্জনের জন্য বিনয় প্রয়োজন। অতএব আপনি আসন থেকে নেমে আমার সামনে বিনীতভাবে বসে পাঠ করুন। ইমামের কথামত হারুনুর রশীদ আসন থেকে নেমে ইমামের সামনে বিনীতভাবে বসলেন এবং মূতা গ্রন্থ পড়তে লাগলেন।
(রাউজুল ফায়েক ১৪৮ পৃঃ)

সবকঃ জ্ঞান অর্জনের জন্য বিনয় ও আনুগত্য প্রকাশ করা প্রয়োজন। আগের যুগে অনেক রাজা বাদশাহগণের অন্তরে জ্ঞানের বিশেষ কদর ছিল।

কাহিনী নং ৪০৭

জামায় বিচ্ছু

একবার ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) হুযূর (সাল্লাল্লাহু আলাইহে ওয়া সাল্লাম) এর হাদীছ বর্ণনা করছিলেন। শ্রোতারা লক্ষ্য করলো যে তাঁর চেহারা কোন কষ্টের কারণে বিবর্ণ দেখাচ্ছিল এবং অস্থিরতাবোধ করছিলেন। এরপরও তিনি হাদীছের দরস ত্যাগ করেন নি বরং যথারীতি বয়ান করতে রইলেন। বয়ান শেষ করার পর শ্রোতারা তাঁর অস্থিরতার কারণ জিজ্ঞেস করলে তিনি তাঁর জামাটা খুললে সেখানে একটি বিচ্ছু দেখা গেল যেটা ওনাকে ছয়বার হুল ফোটায়েছিল। ইমাম মালেক বললেন যে হাদীছের বয়ান করার সময় এ বিচ্ছু আমাকে হুল ফোটাচ্ছিল কিন্তু আমি হাদীছের সম্মানে হাদীছের দরসদান ত্যাগ করিনি। আমার কাছে হাদীছের সম্মান অগ্রগন্য। (রাউজুল ফায়েক ১৪৯ পৃঃ)

কাহিনী নং ৪০৮

ইমাম মালেকের ইন্তেকাল

হযরত ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন, মক্কা মোয়াজ্জামায় আমার ফুফি স্বপ্ন দেখলেন যে কোন একজন বলছেন যুগের সবচে বড় আলেম ইন্তেকাল করেছেন। ইমাম শাফেঈ (রাদি আল্লাহু আনহু) বলেন আমি ঐ দিনই শুনলাম যে হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) ইন্তেকাল করেছেন। (ইন্না লিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহে রাজিউন)

সবকঃ হযরত ইমাম মালেক (রাদি আল্লাহু আনহু) অনেক বড় আলেম ছিলেন। তিনি চার ইমামের অন্যতম।

তৃতীয় খণ্ড সমাপ্ত

চতুর্থ খণ্ডের অপেক্ষায় থাকুন